সোনায় মোড়া নীরজ • বিস্ময়বালক প্রজ্ঞানন্দ • ধারাবাহিক উপন্যাস
আনন্দমেলা
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
ভারতের চন্দ্রজয়
ইসরো-র বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার
ভারতের মহাকাশ অভিযান
কী আছে চাঁদের ও পিঠে?
হাফ ডজন মজার গল্প
উল্লাস মল্লিক
অদিতি ভট্টাচার্য
বিক্রম অধিকারী
ঋতিকা নাথ
বিতান সিকদার
সুবর্ণ বসু

আনন্দমেলা

কমিক্স

৪৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৯ ভাদ্র ১৪৩০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদের ফটো: আইস্টক ও আনন্দবাজার আর্কাইভ

সম্পাদক: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরার এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Rs: 20.00

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 49, Issue 9
RNI Regd No. 27057/75

আনন্দমেলা এ বার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

দস্যি ডেনিস
গোপনীয়তা বনাম উদাসীনতা

আমার একটা গোপন খবর আছে।
তো?

আমি তোমায় বলছি না।
কী এসে যায়?

আমি কিন্তু সত্যি বলছি।
বেশ ভাল তো।

আমায় হাজার বার অনুরোধ করলেও বলব না আর।
আমার কোনও অসুবিধে নেই।

শ-য়-তা-ন ডে-নি-স!

তুমি আমার গোপন খবরের সব মজা মাটি করে দিলে!

সামনেই আসছে শিক্ষক দিবস। তোমার প্রিয় শিক্ষক কে এবং কেন? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

শিক্ষাদানের মহান ব্রত যাঁদের কাঁধে, তাঁরাই হলেন শিক্ষক। তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকে একটা গোটা সমাজ। আচ্ছা, নিজেই যদি নিজের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারি? আমাদের সকলের কাছে এক অন্যতম শিক্ষক হল আমাদের বিবেক। সেই আমাদের শিখিয়ে চলেছে প্রতি নিয়ত। দিনের অন্তিমে শিক্ষাকে যাচাই করে নেয় সে। সে জানে, জীবন্ত-গ্রন্থ থেকে প্রকৃতি পাঠ করতে। তাই আমার কাছে বড় শিক্ষক হল প্রকৃতি-মাতা। চার পাশের সবুজ শিখিয়েছে, কেমন করে এই পৃথিবীতে কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয়। মৃত্তিকা শিখিয়েছে, কেমন করে সবাই মিলে এক সঙ্গে থাকতে হয়। মেঘ শিখিয়েছে, কেমন করে শৃঙ্খল মেনে আনন্দে স্বাধীন জীবন কাটাতে হয়। বাতাস শিখিয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। বৃষ্টি শিখিয়েছে মনের সব দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা কেমন করে পরিশুদ্ধ করতে হয়। ফুল শিখিয়েছে কেমন করে ন্যায্য দাবি জানিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। এখন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এদের শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারি। জীবনে এক জন প্রকৃত মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে এমন শিক্ষকেরই তো প্রয়োজন। তাই আমার কাছে আমার আদর্শ শিক্ষক হল প্রকৃতি, যে শিক্ষা দিয়ে চলেছে অবিরাম।

গোলাপ ফুল

অদ্রিজা ভট্টাচার্য্য
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন
ডানকুনি, হুগলি।

দ্বিতীয়

আমরা যার কাছ থেকে কিছু শিখি, সে-ই তো শিক্ষক। তাই আমরা ছোটবেলা থেকে যার কাছ থেকে কিছু না-কিছু শিখি, তারাই আমাদের শিক্ষক। তা হলে এই শিক্ষক দিবসে আমি মনে করি মা ও বাবাই আমার প্রথম শিক্ষক এবং তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আমার শ্রদ্ধার। তাঁদের জ্ঞান ভান্ডার আমাকে পরিপূর্ণ করে। আমার মা ও বাবা দু'জনেই শিক্ষকতা পেশায় আছে, সে জন্য বলছি না। আমরা যদি ভেবে দেখি, তা হলে দেখব যে, জন্মের পর থেকে আমাদের প্রথম হাঁটা শেখা, কথা বলতে শেখা, বর্ণ পরিচয়, হাত ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখা শেখানো, বার বার করে পড়তে বসতে বলা, সময় ধরে কাজ করা, সমস্ত কিছু শিখে যাচ্ছি আজও। আমাদের ভাল-মন্দ, পছন্দ, চাওয়া-পাওয়া, এঁরা খেয়াল রাখেন। আমার জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছোতে তাঁরা বিরল চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রোজ কত নতুন নতুন বিষয় জ্ঞান লাভ করি তাদের কাছে। তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের শেখান। হয়তো আজীবন এ ভাবেই আমাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করে যাবে। তাই তাঁরা আমার শিক্ষকও, আবার প্রিয় বটে।

ধূর্জতি রায়
অষ্টম শ্রেণি, বীণা মোহিত মেমোরিয়াল
স্কুল, মহিষবাথান, কোচবিহার।

স্কুলের বোর্ড

তৃতীয়

আমার স্কুলে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন। প্রত্যেকেই ভাল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ আমাদের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষিকা অনন্যাদিকে। তিনি বেশ লম্বা ও ফরসা। উনিই আমাদের ক্লাস-টিচার। অনন্যাদি আমাদের ইংরেজি, কম্পিউটার, ইতিহাস, ভুগোল ও সাধারণ জ্ঞান পড়ান। উনি অনেক তথ্য নতুন বলেন। অনন্যাদি জ্ঞানের ভান্ডার। আমাদের উনি খুব কম বকেন। কারও ভুল হলে সেটি সবার সামনে না আলোচনা করে আলাদা করে বলেন ও শুধরে দেন। ওঁর এই আচরণ আমাদের খুব উৎসাহ দেয় ভাল কাজে। উনি মাঝে মাঝে কম্পিউটারের নানান অংশ খুঁজে এনে আমাদের বোঝান। আমার এটা খুব মজা লাগে। অনন্যাদি খুব সুন্দর গানও করেন। আমাদের প্রেয়ারে উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে থাকেন। ওঁর গলার স্বর বেশ গম্ভীর। আমি অনন্যাদির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি। তাই উনি আমার প্রিয় শিক্ষক।

কয়েকটি রঙিন চক

সৃঞ্জয় মৌলিক
দ্বিতীয় শ্রেণি, দোলনা ডে
স্কুল, কলকাতা।

আমাদের সকলের জীবনে বাবা-মায়ের পরে আসে শিক্ষকদের স্থান। তারা আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সকলের মধ্যে অপূর্ব স্যর আমার সবচেয়ে প্রিয়। তবে প্রথম প্রথম আমি ওঁকে খুব ভয় পেতাম। উনি আমাদের চতুর্থ শ্রেণির অঙ্কশিক্ষক ছিলেন। তিনি সব সময় আমাকে সামনের বেঞ্চে বসাতেন যাতে আমি কোন ভুল করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিতে পারেন। আমার ছোট থেকে ছোট ভুলেও তিনি খুব বকতেন। আমাকে যেমন তিনি বকতেন, তার চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসতেন। কিন্তু সেই দিন আমার সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল। আমি ক্লাসে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। তাই আমি ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম এই সুখবরটা দিতে। তখন সেখানকার লোক আমাকে বলল যে, স্যর করোনায় মারা গেছেন। স্যরকে আর দেখতে পেলাম না, কিন্তু ওঁর শিক্ষা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

তথাগত দত্তগুপ্ত
অষ্টম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা।

স্কুলের বেঞ্চ

পঞ্চম

আমার প্রিয় শিক্ষক হল মৌদিদি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, যখন আমি তাঁর কাছে প্রথম পড়তে আসি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তাকে একটু অন্য রকম লেগেছে আমার। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন, ভাল কাজে উৎসাহ দেন। তিনি আমাদের অনেক হাসি, দুঃখ ও রহস্যময় গল্প বলেন। তাঁর প্রত্যেকটা কথা আমার বার বার শুনতে ইচ্ছে হয়। তাঁর থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তিনি আমার শুধু শিক্ষিকাই নন, বরং আমার দিদির মতো। ঠিক কৃষ্ণের মতো তিনি আমাকে সব কিছু লক্ষ করতে শেখান। কৃষ্ণের মতোই তিনি আমার আর এক গুরু। তাঁর মতো শিক্ষক আমি যেন বারে বারে পাই।

ডাস্টার

ঋষিকা রায়
সপ্তম শ্রেণি, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর, হুগলি।

আরও যারা ভাল লিখেছে

মুগ্ধ আদিত্য
অষ্টম শ্রেণি, অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

উষ্ণিক পাত্র
কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

অদ্রিজা চিকি
তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট জন্‌স ডায়োসেশন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলকাতা।

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়।

শ্রিঙ্কা সাহা
সপ্তম শ্রেণি, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর, হুগলি।

রঙ্গন সাধুখাঁ
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর।

কৌশিকী পোদ্দার
পঞ্চম শ্রেণি, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর, হুগলি।

আদৃতা ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, বোলপুর গার্লস হাই স্কুল, বোলপুর,বীরভূম।

ইমন নাগ
সপ্তম শ্রেণি, বৌলাসীনি বিবেকানন্দ হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

এ বারের প্রতিযোগিতা

কী ভালই না লাগে এই সময়ের সোনালি রোদ্দুরটা। এই রোদের অদ্ভুত সুন্দর রংটার সঙ্গে তোমার চেনা কোন জিনিসের মিল পাও?

যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লেখা পাঠাবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। মনে রেখো। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ অক্টোবর সংখ্যায় ছাপব। anandamelamagazine@gmail.com এই ইমেল আইডি-তেই লেখা পাঠাবে, মেলবডিতে পেস্ট করে। ফটো তুলে পাঠাবে না।

রেডি-স্টেডি-গো ডিগবাজি (পর্ব-১০)

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় যাচ্ছি বলো তো? এ তো দেখছি গরিব-গুর্বোদের বাড়ি। খুবই গরিব।
রেল লাইনের ধারের বস্তি! লোকটা এইখানে থাকে?
এদের তো তবু বাড়ি আছে, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন বাড়িও ছিল না তোমার!
ডোন্ট ইনসাল্ট মি! বড় বিজ্ঞানী ছিলে হয়তো কিন্তু ভদ্রলোক হতে পারোনি!

(ক্রমশ)
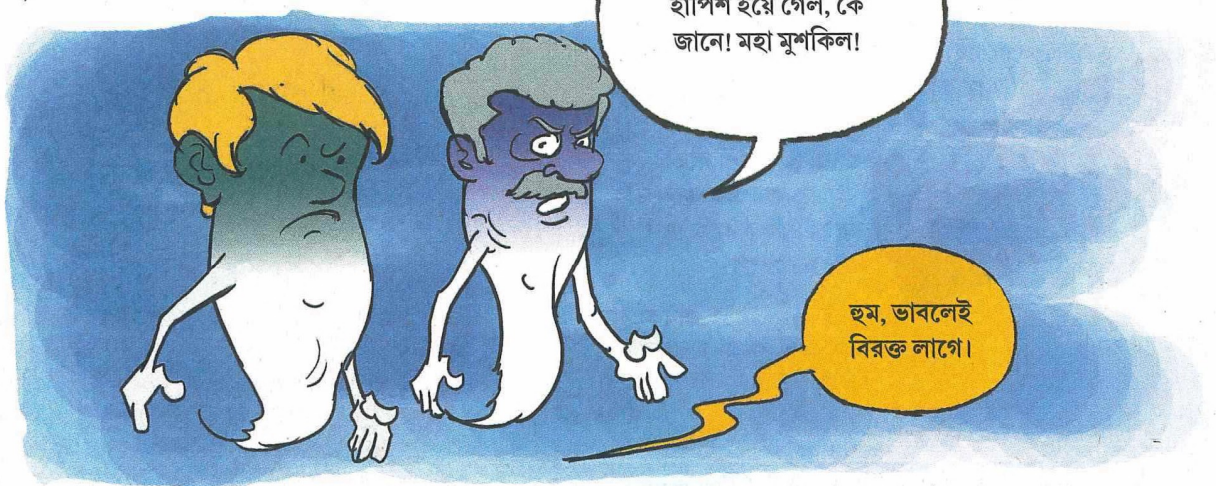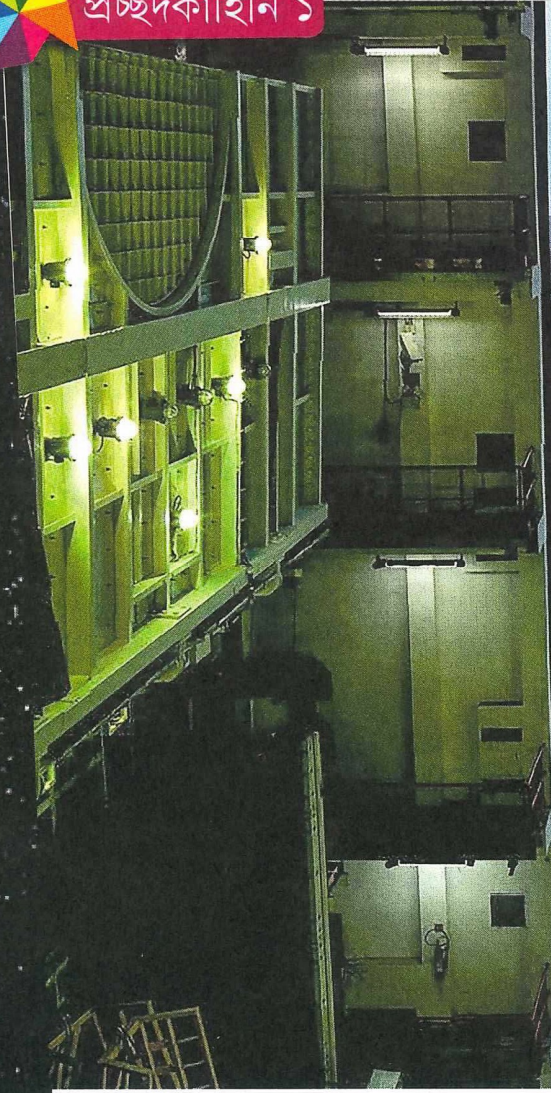
এই রকেটই নিয়ে যাবে আদিত্য-কে

ইসরো-র আগামী লক্ষ্য

কোন পথে এগিয়ে সফল হল চন্দ্রযান-৩? এর পর ইসরো-র ঝুলিতে আর কী? জানালেন ইসরো-র সিনিয়র সায়েন্টিস্ট (প্রপেল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, প্রপেল্যান্ট পলিমার্স কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটেরিয়ালস এনটিটি) **সুহাস মুখোপাধ্যায়**

ইসরো-য় আমার কাজ মূলত কেমিক্যাল প্রোপালসন নিয়ে। এর মধ্যে একটা কাজ, রকেটের কঠিন জ্বালানি তৈরি করা। তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছ, চন্দ্রযান-৩-কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল যে রকেটে চাপিয়ে, তার নাম লঞ্চ ভেহিকল মার্ক ৩, সংক্ষেপে এলভিএম-৩। এখনও অবধি ভারতের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট এটিই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান এড়িয়ে এই রকেট যাতে নির্বিঘ্নে মহাকাশে পৌঁছে যায়, সেটা নিশ্চিত করতে এই রকেটে তিন রকম জ্বালানি পুরে দেওয়া হয়েছিল। তারই মধ্যে এক রকম জ্বালানি সলিড ফুয়েল বা কঠিন জ্বালানি। এই কঠিন জ্বালানি তৈরি করাই আমাদের কাজ। এলভিএম-৩-এর দু'পাশে ২৫ মিটার লম্বা দুটো এস-২০০ বুস্টার ইঞ্জিন লাগানো ছিল। নামের মধ্যে ওই '২০০' বোঝাচ্ছে, প্রত্যেক বুস্টারের ওজন ছিল ২০০ টন। এই জ্বালানির ব্যালিস্টিক্স কেমন হবে, সেটা দেখাও আমাদের কাজ। ব্যালিস্টিক্স মানে, জ্বালানি কী ভাবে পুড়বে আর তার জেরে কতটা ফোর্স (বল) তৈরি হবে। এই ফোর্সই রকেটকে উর্ধ্বমুখে ঠেলা দেয়, যাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় বলে, 'থ্রাস্ট'।

এ আর কী এমন কঠিন কাজ। জ্বালানি যত বেশি দেব, তা জ্বলেপুড়ে তা থেকে ততই বেশি থ্রাস্ট তৈরি হবে— তা-ই ভাবছ

কি? সম্পর্কটা কিন্তু আসলে এত সহজ নয়। কঠিন জ্বালানির ক্ষেত্রে তা পুড়লে কতটা থ্রাস্ট তৈরি হবে, তা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর। যেমন আমি যে জ্বালানিটা পোড়াচ্ছি, তার জেরে কত তাপ উৎপন্ন হবে। এমনকি, কঠিন জ্বালানিটার জ্যামিতিক আকার কেমন হবে, তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। এক-একটা মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এক-এক রকম জ্বালানি তৈরি করতে হয়। কোন পথে রকেট যাবে, তার উপর নির্ভর করে, সলিড ফুয়েলের আকার কেমন হতে হবে। এলভিএম-৩ রকেটে যে তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার লিকুইড ইঞ্জিনের অনেক সামগ্রীও আমরাই তৈরি করেছিলাম। চন্দ্রযান-৩ চাঁদে সফল ভাবে অবতরণ করবে এই বিশ্বাস আমাদের ছিল, যেহেতু চন্দ্রযান ২-এর অরবিটার এখনও চাঁদের চার দিকে পাক দিয়ে আমাদের নিরন্তর চাঁদের হালহকিকত জানিয়ে যাচ্ছে। গত বারের ভুল থেকে শিখে আমরা এ বার সবই শুধরে নিয়েছিলাম, তৈরিই ছিলাম। চাঁদ ছুঁয়ে ইসরো-র পরের অভিযান সূর্যের উদ্দেশে। এই লেখা যখন পড়ছ, তত ক্ষণে সূর্যের উদ্দেশে রওনা দিয়ে দিয়েছে ভারতের মহাকাশযান, 'আদিত্য'। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গা আছে, যেখানে সূর্য আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান একে অন্যকে প্রশমিত করে দেয়। এই জায়গাগুলোকে বলা হয় ল্যাগর‍্যাঞ্জ পয়েন্ট। আদিত্য ও রকম একটা ল্যাগর‍্যাঞ্জ পয়েন্টে গিয়ে সূর্যকে ঘিরে পাক খেতে থাকবে আর সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে ছিটকে বেরোনো বিভিন্ন রকম রশ্মি পরখ করে দেখবে তাদের তীব্রতা ও অন্যান্য দিক। চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে সফল অবতরণ করেছে। পরের অভিযান আদিত্য-ও তৈরি। এর পর ইসরো-র লক্ষ্য, 'গগনযান' প্রেরণ। এই যানে মানুষকে মহাকাশে পাঠানো হবে, যারা ওই যানে চেপেই পৃথিবীকে আবর্তন করবেন বেশ কয়েক দিন। কোনও চন্দ্রযানেই মানুষ ছিল না, কিন্তু গগনযানে থাকবে। গগনযান তৈরিতে তাই আরও বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও ইসরো তৈরি করছে ভারতের নিজস্ব জিপিএস সিস্টেম, যার নাম 'নাবিক' (NavIC)। মার্কিন জিপিএস-এর তুলনায় এই জিপিএস আরও বেশি নিখুঁত এবং নির্ভুল লোকেশন দেবে। ইতিমধ্যেই দেশের সমস্ত ফোন কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনে তৈরি সমস্ত ফোনের হার্ডওয়্যারে এই নাবিক সিস্টেম ভরে দেওয়ার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ (যার সাহায্যে আমরা স্থলে-জলে-আকাশে সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগও উপভোগ করি) সারা বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর কাজে সেই দেশকে সারা বিশ্ব ভরসা করবে, যার কাছে আকাশে যাওয়ার উন্নততম প্রযুক্তি আছে। তাই গগনযান সফল হলে কিংবা নাবিক কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেলে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রযুক্তি আরও সমাদর পাবে। লক্ষ কোটি ডলারের বিনিয়োগ আসবে দেশে।

তৈরি হচ্ছে আদিত্য

সুহাস মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রযান কিংবা আসন্ন গগনযানেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের (এআই) সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই এআই-গুলোও আমাদের বিজ্ঞানীরাই তৈরি করেছেন। চন্দ্রযান-৩-এও শুধু অ্যাটমিক ক্লকের (সাধারণ ঘড়ির চেয়ে অনেক নিখুঁত এক ঘড়ি) সামান্য কিছু অংশ ছাড়া সমস্তটাই সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল। মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের এই জয়যাত্রায় তোমরাও শামিল হতে চাইলে তোমাদের বিজ্ঞানটা মন দিয়ে পড়তে হবে। বুঝে বুঝে পড়তে হবে। বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় পড়েই ইসরো-র কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করা যায়। এ দেশের বহু ছেলেমেয়ে আজও মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা-য় কাজ করার স্বপ্ন দেখে। গর্বের সঙ্গে বলা যায়, মহাকাশকে জানার কারও আগ্রহ থাকলে সেই স্বপ্ন এখন পূরণ হতে পারে ইসরো-তেও। এ দেশে বসেই।

ফটো: আনন্দবাজার আর্কাইভ, লেখক
সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: অচ্যুত দাস

চন্দ্রযান-৩-কে নিয়ে 'বাহুবলী' রকেটের যাত্রা শুরুর মুহূর্ত

ষাট বছরে চাঁদের মেরুতে

পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছে ভারত। সারা পৃথিবীকে চমকে দেওয়া এই সাফল্যের পিছনে আছে ষাট বছরের পরিশ্রম। লিখেছেন **অচ্যুত দাস**

গত ২৩ অগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে প্রথম সফল অবতরণ করে সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে ভারত। কেন এই অভিযান, কবে এই অভিযান শুরু আর শেষ, কী এর প্রয়োজন, এ সমস্তই এত ক্ষণে কোনও না-কোনও মাধ্যম হয়ে তোমাদের চোখে কানে এসে পড়েছেই, জানি। আমরা তাই শুরু করব গল্পের একেবারে প্রথম পাতা থেকে। সে পাতার এক কোনায় দেখছি তারিখ লেখা... ঠিক ষাট বছর আগের!

গির্জায় বিজ্ঞানের 'বিক্রম'

দুশো বছরের ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে সবে বছর পনেরো হয়েছে। ১৯৬৩ সাল। লম্বা চওড়ায় এত বড় আমাদের দেশের আনাচকানাচে লাখো মানুষ তখনও ডুবে আর্থিক দৈন্যে। রোগ মহামারি অনাহার মেটাতে তখনও মানুষের প্রথম ভরসা ভগবান। ভারতের একেবারে দক্ষিণে, কেরলের থুম্বা গ্রামে সেন্ট মেরি ম্যাগডালেন গির্জায় যেমন আজ সকাল সকাল প্রার্থনার জন্য জড়ো হয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু আজকের দিনটা অন্য দিনের চেয়ে আলাদা। প্রার্থনাসভায় বিশপ আজ এ কী বলছেন! দেশের নানা প্রান্ত থেকে কয়েক জন বিজ্ঞানী এসে নাকি এই গির্জায় বসেই গবেষণা করতে চান। সেই বিজ্ঞানীদের গণনা নাকি বলছে, ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণতম প্রান্তে কেরলের এই গ্রামেই নাকি তাঁদের গবেষণা সফল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সে কথা জানিয়েই গ্রামবাসীদের

কাছে বিশপ করজোড়ে অনুরোধ করছেন, তাঁরা সবাই মিলে যেন এই গির্জা ও সংলগ্ন এলাকা বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দেন। থুম্বা সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম। মৎস্যজীবীরাই সেখানে বেশি। বিশপের আর্জি শুনে তাঁরা বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে যেই রাজি হলেন, ব্যস, শুরু হল ভারতের প্রথম মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা। ষাট বছর আগে এ দেশের এক নির্দিষ্ট গির্জার উপাসনাগৃহকে বিজ্ঞানের গবেষণাগৃহ বানানোর এই দুঃসাহস যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল, সেই মানুষটির নাম? তিনিই বিক্রম সারাভাই। ক'দিন আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে নামল ভারতের যে ল্যান্ডার, তার নাম ভারতের মহাকাশ প্রকল্পের এই প্রাণপুরুষের নামেই।

গির্জার ভোল পাল্টে তাকে গবেষণাগার বানাতে বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে যে বিজ্ঞানীরা তার পর থুম্বায় থাকতে শুরু করলেন, তাঁদের অন্তত এক জনের নাম তোমরা সবাই জানো। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়ে অনেক বছর পরে তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। তিনি ড. এপিজে আব্দুল কালাম। তরুণ কালাম ও তাঁর সহকর্মীরা সেই গির্জার জায়গায় তৈরি করেছিলেন, 'থুম্বা ইকুয়েটোরিয়াল রকেট লঞ্চ স্টেশন', যে সংস্থারই পরে নাম হবে 'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার'।

ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথ

কালাম পরে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গির্জার প্রার্থনাগৃহকে তাঁরা বদলে ফেলেন রকেট অ্যাসেম্বলি সেন্টারে, অর্থাৎ যেখানে রকেটের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা করে এনে এক সঙ্গে জোড়া যায়। ষাট বছর আগের কথা। তাই সাইকেলে, কখনও বা গরুর গাড়িতে চাপিয়েও রকেটের যন্ত্রাংশ থুম্বায় নিয়ে যেতেন বিজ্ঞানীরা। সে বছরই, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, থুম্বার মাটি থেকে উড়েছিল ভারতের প্রথম রকেট।

সাইকেলে যাচ্ছে রকেটের যন্ত্রাংশ, থুম্বায়

থুম্বার সেই গির্জা, এখন সেখানে জাদুঘর

কিন্তু থুম্বাই কেন?

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন)-র জন্ম ১৯৬৯ সালে। ইসরোর ঠিক এর আগের চন্দ্রাভিযানে চন্দ্রযান-২ চাঁদের মাটি ছুঁতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কাঙ্ক্ষিত 'সফট ল্যান্ডিং' তার দ্বারা পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাতে আমাদের শাপে বর হয়েছিল এই কারণে যে, চন্দ্রযান-২-এর ভুল থেকে যা যা শিক্ষণীয়, সবই শিখে নিয়েছিলেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযান-২-এর ক্যামেরায় ধরা পড়া অজস্র ফটো খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, চাঁদের মেরুর কাছে কোথায় খানাখন্দ কম, কারণ সেখানেই নামবে পরের চন্দ্রযান। চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ তাই বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটা প্রত্যাশিতই ছিল। ষাট বছর আগে কেরলেও বিক্রম সারাভাই, আব্দুল কালাম প্রমুখ নিশ্চিত ছিলেন, থুম্বা থেকে রকেট ছুড়লে তা সহজে উড়বেই আর আর্থিক ভাবে গরিব দেশের জন্য যেটা তার চেয়েও বড় সাফল্য— উড়বে কম খরচে।

এর কারণ, থুম্বার গা ঘেঁষে গেছে পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখা বা ম্যাগনেটিক ইকুয়েটর। অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখার মতো

ডান দিকে বসে আছেন আব্দুল কালাম

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সতীশ ধওয়ন (ডান দিকের জন)
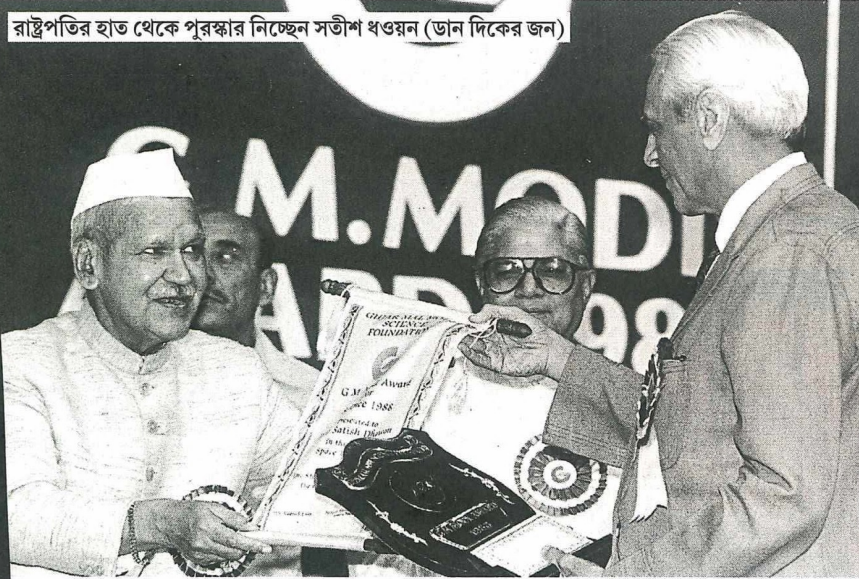
এ-ও পৃথিবীর গায়ে মানুষের কল্পনায় আঁকা একটা বক্ররেখা। কিন্তু পৃথিবী নিজেই একটা বিশাল চুম্বক হওয়ায় দেখা গেছে, তার চৌম্বক বিষুবরেখার উপর দাঁড়িয়ে রকেট ছুড়লে সে রকেট অনেক সহজে ঊর্ধ্বপানে ছুট লাগায়, তাই জ্বালানি খরচও কম হয়। এ কথা জানা ছিল বলেই সারাভাই ছুটে এসেছিলেন থুম্বায়। স্বাধীনতার মাত্র যোলো বছর পর দেখিয়ে দিয়েছিলেন সারা পৃথিবীকে, চাইলে আমাদের দেশও আকাশ পেরিয়ে মহাকাশ ছুঁয়ে আসতে পারে।

আজ ব্যর্থ, কাল সফল

রকেট ছুড়ে তাকে মহাকাশে পাঠানো আর রকেটে চাপিয়ে চাঁদে যান পাঠানো, এ দুইয়ের মাঝে ফারাক বহু বছরের। নাছোড়বান্দা কিছু মানুষের কয়েক দশকের পরিশ্রমের সুফলই চন্দ্রযান-৩-কে সফল করেছে। ১৯৬৩ সালে প্রথম বার রকেট আকাশে পাঠানো গেল, কিন্তু রকেট একা আকাশে গিয়ে আর কতটুকু করবে? আচ্ছা, মানুষ না হয় তক্ষুনি না-পাঠানো গেল, অন্তত মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বসাতে চাইলে? তাকেও তো রকেটে চাপিয়েই সেখানে পাঠাতে হবে।
গত জুলাইয়ে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের উদ্দেশে রকেটে চেপে রওনা দিয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধওয়ন স্পেস সেন্টার থেকে। ১৯৭৯ সালের অগস্ট মাসে সেখান থেকেই কৃত্রিম উপগ্রহ বহনকারী দেশের প্রথম 'স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল', এসএলভি-৩ উৎক্ষেপণের চেষ্টা করেছিল ভারত। নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল কালাম। সে রকেট উড়ল বটে, কিন্তু মাঝপথেই ভেঙে বঙ্গোপসাগরের জলে আত্মাহুতি দিল। শুধু তো রকেট নয়, তাকে আকাশে পাঠানোর খরচটারও সলিলসমাধি হল যেন। কাঁচুমাচু মুখে কালাম গেলেন ইসরোর তৎকালীন প্রধান, বিজ্ঞানী সতীশ ধওয়নের কাছে। যে দেশে এখনও লক্ষ মানুষ অনাহারে দিন কাটান, সেখানে আকাশে রকেট পাঠাতে বিপুল টাকা খরচ করে কী লাভ, যদি সেই চেষ্টা ব্যর্থই হয়? এই প্রশ্ন যে মানুষ করবেন, সতীশের মতো কালামও তা জানেন বিলক্ষণ। অথচ আশ্চর্য, সতীশ নিজে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে নিলেন। আর আড়ালে কালামের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আবার নতুন করে পরিকল্পনা সাজাব।"
এগারো মাসও লাগল না, ঠিক পরের বছর, ১৯৮০ সালের জুলাইয়ে শ্রীহরিকোটা থেকে কালামের নেতৃত্বে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পৌঁছে দিল এসএলভি, এত দিন যাকে অনেকেই 'সি লাভিং ভেহিকল' নামে ডেকে মুখ টিপে হাসাহাসি করছিল।
সারাভাইকে যেমন ভারতের মহাকাশ প্রকল্পের জনক বলা হয়, সতীশও তেমনই অমর হয়ে আছেন সেই প্রকল্পের উজ্জ্বল দিশারী হয়ে।

বাহুবলী রকেট

কখনও গাড়ি চেপে কোথাও যেতে গিয়ে গাড়ির স্পিডোমিটার লক্ষ করেছ? ফাঁকা রাস্তায় হু হু করে ষাট-সত্তর-আশি কিলোমিটার বেগে গাড়ি ছুটছে, এ অবধি আমরা মনে মনে খুব সহজেই ভেবে নিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান এড়িয়ে পালাতে চাইছে যে রকেট, তাকে ঘণ্টায় ছুটতে হবে অন্তত ২৮৬৪৬ কিলোমিটার! ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট এলভিএম-৩ (লঞ্চ ভেহিকল মার্ক ৩) চন্দ্রযান-৩-কে মাত্র যোলো মিনিটে পৃথিবীর আকাশে 'পার্কিং

অরবিট'-এ পৌঁছে দিয়েছে তার চেয়েও বেশি বেগে ছুটে গিয়ে। এই কক্ষপথেই পৃথিবীর অভিকর্ষ টান আর রকেটের ভরবেগ একে অন্যকে কাটাকুটি করে দেয়। ফলে ওই পথ ধরে আকাশে ভেসে পৃথিবীকে পাক দেওয়া যায়।
উৎক্ষেপণের সময় প্রায় চোদ্দো তলা বাড়ির সমান লম্বা এলভিএম-৩-এর ওজন ছিল প্রায় ৬৪২ টন। 'বাহুবলী' এই রকেটে ইঞ্জিন আছে তিন-তিনটে। তার একটা কঠিন জ্বালানি পুড়িয়ে রকেটকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে দেয় এবং অতঃপর রকেট থেকে আলাদা হয়ে খসে পড়ে। তার পরের ইঞ্জিন এর পর তরল জ্বালানি পুড়িয়ে রকেটকে আরও গতি দেয় এবং জ্বালানি ফুরোলে সে-ও, রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায়। সবার শেষে জ্বলে রকেটের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের জ্বালানি। জল যেমন শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে কঠিন বরফ আর ১০০ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রায় গ্যাসীয় বাষ্প, তেমনই -১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেন আর -২৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে তরলে পরিণত হয়। এই বিশেষ তরল জ্বালানি পুড়িয়ে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন ঘণ্টায় প্রায় ৩,৭,০০০ কিমি গতিবেগ পায়। এই গতিতেই সে চন্দ্রযান-৩-কে পৌঁছে দিয়েছিল পৃথিবীর পার্কিং অরবিটে।

থুম্বায় রকেটের যন্ত্র আসত গরুর গাড়িতেও

বিক্রম সারাভাই (বাঁ দিকে), তাঁর শিক্ষক সিভি রমনের সঙ্গে

চাঁদে পৌঁছোনোর রাস্তা

পার্কিং অরবিটে পৌঁছোনোর পর চন্দ্রযান-৩ পৃথিবীর চতুর্দিকে পাক খেতে খেতে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে। পৃথিবীকে ঘিরে তার প্রাথমিক বৃত্তাকার কক্ষপথ প্রত্যেক পাকে আরও উপবৃত্তাকার হতে থাকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে কক্ষপথ বাড়ানোর এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম, 'অরবিট রেইজ়িং ম্যানুভার'। এই করতে করতেই এক সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ভুলে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ টানে সাড়া দিয়ে তাকে ঘিরে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে, যে প্রক্রিয়াকে বলে, 'ট্রান্স লুনার ইঞ্জেকশন'। তার পর আর কী? পৃথিবীর মায়া কাটানোর সময় যে ভাবে চন্দ্রযান-৩ অরবিট রেইজ়িং ম্যানুভারের খেল দেখিয়েছিল, এ বার ঠিক তার উল্টোটার পালা। উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ক্রমে ছোট হয়ে বৃত্তাকার হতে থাকল। চন্দ্রযান-৩ নিজের গতি কমাতে কমাতে অবশেষে ২৩ অগস্ট চাঁদের পিঠে পূর্বনির্ধারিত জায়গায় 'সফ্‌ট ল্যান্ড' করল। আর এই সমস্ত হতে সময় লাগল এক মাসেরও বেশি।

এত সময় লাগল কেন?

কিন্তু মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা-র অ্যাপোলো মিশনে সেই কবে ১৯৬৯ সালে চাঁদে পৌঁছোতে এর চেয়ে অনেক কম সময় লেগেছিল না? মাত্র তিন-চার দিন? আমাদের এত বেশি লাগল কেন? এর উত্তরে ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেছেন, "যে সমস্ত দেশ তাড়াতাড়ি চাঁদে পৌঁছোতে চেয়ে সেই মতো মিশন ডিজ়াইন করেছিল, তারা সেই ডিজ়াইন অনুযায়ী দ্রুতই পৌঁছেছে। আমাদের চন্দ্রযানে কোনও মানুষ যাচ্ছে না, তাই আমরা ধীর গতির মিশন ডিজ়াইন করেছি। আমাদের রকেট তো খুব শক্তিশালী নয়। তা ছাড়া চন্দ্রযান কখন ঠিক কোথায় আছে, কী করছে, তা জানার জন্য আমাদের সারা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রাউন্ড স্টেশনের উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য প্রতি পদে যাচাই করে তবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ পরিকল্পনা করতে হয়। এই সব কারণেই আমরা বেশি সময় নিয়েছি।"

বলা হয়, মানুষ তা-ই সত্যি করে দেখাতে পারে, যা সে কল্পনা করতে পারে। আকাশে ভেসে বেড়ানো রুপোলি চাঁদে যে কোনও দিন পৌঁছোনো সম্ভব, সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারেননি। বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। বাস্তবে করেও দেখিয়েছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-২-এর অবতরণ ব্যর্থ হয়েছে যখন, ইসরো-র বিজ্ঞানীরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু হতাশ হননি। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। ভারতের চন্দ্রাভিযান থেকে আমরাও শিখলাম— আগামী সাফল্যের স্বর্ণরেণু লুকোনো থাকে ফেলে আসা ব্যর্থতার ছাইয়ের তলেই।

ফটো: আনন্দবাজার আর্কাইভ, এক্স

ভরসা দিল অন্ধকার

কী রয়েছে চাঁদের অন্ধকার মেরুতে? লিখেছেন **যুধাজিৎ দাশগুপ্ত**

অন্ধকার?

তা, এক রকমের অন্ধকার তো বটেই। যার সম্পর্কে আমরা তেমন জানি না, বলি সেটা অন্ধকারে রয়েছে। যেমন চাঁদের উল্টো পিঠ। আমরা আকাশে যুগের পর যুগ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেও চাঁদ তার মুখ ঘোরায় না। 'অন্ধকার' হয়েই রয়ে যায়। বরাবর লোকে বলে এসেছে 'ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন'। শেষ অবধি ১৯৫৯ সালে, আজ থেকে ৬৪ বছর আগে, তখনকার সোভিয়েট রাশিয়ার পাঠানো এক মহাকাশযান লুনা-৩, চাঁদকে চক্কর দেওয়ার ছলে সেই প্রথম চাঁদের উল্টো পিঠে উঁকি দিল। তার ক্যামেরায় তোলা ফটো গোটা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখল। এই কি চাঁদ? এই আমাদের চাঁদটাই? এত অন্য রকম কেন?

না, উল্টো পিঠটা যে আদতে অন্ধকার নয় সেটা আগেই সকলে জানত। চাঁদের একটা পিঠ বরাবর আমাদের দিকে ফেরানো বটে, কিন্তু সূর্য তার গোটাটাই দেখতে পায়, ঘুরে ঘুরে চাঁদের সবখানে সূর্যের আলো পড়ে। যেমন, পৃথিবীতে যে দিনটায় অমাবস্যা, ঠিক সেই দিনেই চাঁদের উল্টো পিঠে

শিল্পীর কল্পনায় থিয়া ও পৃথিবীর সংঘর্ষ, যার জেরে তৈরি হল চাঁদ

উজ্জ্বল পূর্ণিমা। কাজেই কথা তা নয়। কথা হল, সকলে বলাবলি করতে থাকল, চাঁদের উল্টো পিঠ এমন লেপাপোঁছা কেন? পৃথিবী থেকে দেখা চাঁদের পিঠটাতে এত যে কলঙ্কের দাগ, উল্টো পিঠে তা প্রায় নেই বললেই চলে, খুব কম কালচে জমি রয়েছে।

চাঁদের বুকে বড় বড় কালচে দাগগুলোকে আমরা নাম দিয়েছি সাগর, জল নেই জেনেও দিয়েছি। বলা হয় দূর অতীতে বিরাট বিরাট উল্কা এসে ওখানে আছড়ে পড়েছে, তার ধাক্কায় চাঁদের পেটে থাকা তরল ম্যাগমা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ওসব জায়গায়। তাতে লোহার ভাগ বেশি বলে আশপাশের জায়গাগুলোর থেকে বেশি কালচে দেখায়। উল্টো পিঠেও উল্কা কিছু কম পড়েনি, কিন্তু সম্ভবত সে পিঠের অনেক দূর নীচে ছিল লাভার পিণ্ড, সহজে তাই মাটি ফেটে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এখন ভাবি, ভাগ্যিস ওই পিঠটাই আমাদের দিকে ঘুরে আটকে থাকেনি, নইলে চাঁদের মা-বুড়িকে আমরা ওখানে পেতাম কি?

ছোট-বড় অজস্র উল্কা চাঁদের পিঠে যেন অগুনতি ফোস্কার দাগ তৈরি করে দিয়েছে। সেখানে আছে বেশ বড় বড় গহ্বর, সেগুলো শুধু নীচের দিকেই গভীর নয়, উল্কার ধাক্কায় সেগুলোর কানা বরাবর মাটি ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে বসে সে সব গহ্বরের এক-একটা নাম দিয়েছি বটে আমরা, চেনার সুবিধের জন্য, কিন্তু সত্যি

রাশিয়ান চন্দ্রযান লুনা-৩

সত্যি চাঁদকে তেমন চিনে উঠতে পারিনি। যেমন, চাঁদ কী করে তৈরি হয়েছিল সেটা নিয়েই রয়ে গেছে খটকা। এখন যে মতটা নিয়ে সকলে বলাবলি করছে, তা হল পৃথিবী যখন সবে তৈরি হয়েছে, সেই সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে— তখন আর একটা বড় গোলা, যেটা মাপে প্রায় আজকের মঙ্গল গ্রহের সমান, ছুটে এসে ধাক্কা মেরেছিল পৃথিবীকে। গায়ে-পড়া সেই আগন্তুকের নাম দেওয়া হয়েছে থিয়া। তার ধাক্কায় দুটো পিণ্ড থেকেই মালমশলা প্রায় গলে তরল হয়ে ছিটকে উঠেছিল শূন্যে, সেই ছড়ানো মালমশলা ধীরে জমাট বেঁধে তৈরি হয়েছে চাঁদ। আর পৃথিবী তাকে বন্দি করে ফেলেছে নিজের মাধ্যাকর্ষণের টানে। সদ্য কয়েক জন বিজ্ঞানী বলতে লেগেছেন, ধীরে নয় মোটেও, সংঘর্ষের মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতর জন্ম নিয়েছিল চাঁদ। হবেও-বা। তবে সত্যি কথাটা হল, চাঁদের জন্মবৃত্তান্ত এখনও অন্ধকারে, এখনও মাথা চুলকে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তারই সঙ্গে এ বার সকলের নজর পড়েছে চাঁদের সত্যিকারের অন্ধকার দিকটাতে। চাঁদের মেরু অঞ্চলে। মেরু এলাকা অন্ধকার হতে যাবে কেন? ওখানে কি সূর্যের আলো পৌঁছোয় না? পৌঁছোয়, আবার পৌঁছোয়ও না। পৃথিবীর কথা ভাবো। মেরু এলাকায়

সূর্যকে চাঁদ থেকে যেমন দেখায়

গহ্বরগুলোর ভিতর কোনও দিনই সূর্যের আলো পৌঁছোয় না। চাঁদের সত্যিকারের অন্ধকার দিক বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই গহ্বরগুলোর অন্দরমহল। আমরা এত দিন একটা ভুল জায়গাকে ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন বলে এসেছি।
এই অন্ধকারটাই আলো দেখিয়েছে আমাদের ইসরো-র বিজ্ঞানীদের। তবে তার আগে আরও দুটো ঘটনা বলা দরকার। প্রথমটা হল, পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে পাঠানো আমেরিকার দুটো মহাকাশ যান, ক্লেমেন্টাইন আর লুনার প্রসপেক্টর। তারা চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে করতে চাঁদের মাটিতে জলের আভাস পেয়েছিল। না, মরূদ্যানের বুকে যেমন জল টল টল করে তেমন নয় মোটেও, তাদের মনে হয়েছিল চাঁদের ধুলোমাটির মধ্যে মিশে আছে জলের বরফ। ভুললে চলবে না, দিনের বেলায় চাঁদের বিষুব অঞ্চলে তাপমাত্রা চড়ে যায় ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস— ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি। সেখানে আর যাই হোক তরল জল থাকার সম্ভাবনা নেই, মাটির উপর দিককার জলও উবে যাবে মুহূর্তে। রয়ে যাবে যদি অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে থাকে সেই জল, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না কোনও দিন। অন্ধকার নামলে এমনিতেই চাঁদের তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ১৩০ ডিগ্রিতে, মেরু

চাঁদের গায়ে এমন গহ্বর অনেক

লুনা-৩-র তোলা চাঁদের উল্টো পিঠের প্রথম ফটো
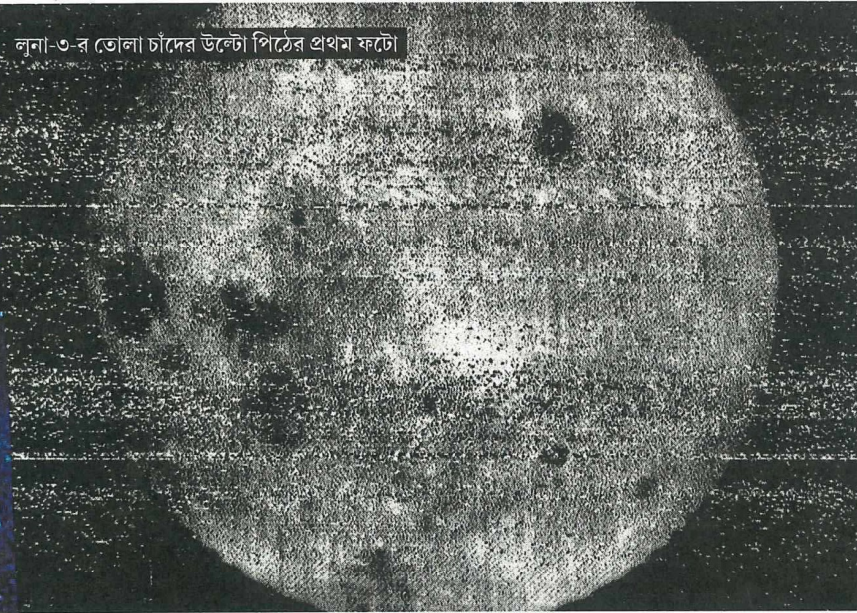
সূর্যকে মাটি থেকে খুব একটা বেশি উপরে দেখা যায় না— শীত কাল হলে তো কথাই নেই, টানা কয়েক মাস সে দিগন্তের নীচে চলে যায়। ফলে ও সব জায়গায় সূর্যের আলো ভীষণ রকম তেরছা ভাবে পড়ে। ঋতুবদলের সঙ্গে তেরছা থাকার পরিমাণ কম-বেশি হয় অবশ্য, কিন্তু আমাদের দেশে যেমন মাথার উপর সূর্যকে দেখি, তেমন অবস্থা ওখানে কখনও হয় না। খাড়া ভাবে পড়া আলোর তুলনায় তেরছা আলোর জোর অনেক কম। সে কারণেই মেরু অঞ্চল এত ঠান্ডা। চাঁদের মেরু এলাকায় অবস্থা আরও খারাপ। কারণ পৃথিবী তবু সাড়ে তেইশ ডিগ্রি হেলে ঘুরছে বলে মেরু এলাকায় তেরছা ভাবটা সাড়ে তেইশ ডিগ্রির ভিতর বাড়তে-কমতে পারে, কিন্তু চাঁদ ঘুরছে প্রায় সটান খাড়া ভাবে, মাত্রই দেড় ডিগ্রি হেলে আছে সে। মেরুতে শীত-গ্রীষ্ম খেলা করার উপায় নেই। ও দিকে মেরু অঞ্চলের গহ্বরগুলো গভীর তো বটেই, সে সবের ধার বরাবর রয়েছে উঁচু দেওয়াল। তোমরাই বলো, গভীর অন্ধকার গর্তের ভিতরটা দেখতে গেলে তার উপর খাড়া ভাবে আলো ফেলা জরুরি কি না? চাঁদের মেরু অঞ্চলে সেটা হওয়ার উপায় নেই, সূর্যের আলো সেখানে পড়ছে তেরছা ভাবে। তার মানে ওখানকার বড় বড়

ক্লেমেন্টাইন মহাকাশযান

চাঁদে ভবিষ্যতে এমনই কলোনি তৈরির ইচ্ছে বিজ্ঞানীদের

অঞ্চলে অন্ধকার গহ্বরে হয়তো তখন তা মাইনাস ১৯০ ডিগ্রি! তুলনা হিসেবে বলি, আন্টার্কটিকায় সবচেয়ে কম তাপমাত্রা যা মাপা গিয়েছে, অর্থাৎ আজ অবধি পৃথিবীতে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা যা ধরা পড়েছে, সেটা মাইনাস ৮৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চাঁদে মেরুর গহ্বরে এক বার বরফ হয়ে জমলে সে জল কিছু কিছু উবে গিয়েও থেকে যাবে দীর্ঘকাল।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল যখন ২০০৮ সালে আমরা চন্দ্রযান-১ পাঠালাম মহাকাশে। তখন তাতে আমেরিকার নাসা একটা যন্ত্র ভরে দিয়েছিল, 'মুন মিনেরোলজি ম্যাপার'। সেই যন্ত্র থেকে যে খবর মিলল তাতে আর সন্দেহ রইল না— চাঁদের মেরুতে সত্যিই জল, মানে বরফ আছে, আরও দেখা গেল, উত্তর মেরুর তুলনায় দক্ষিণ মেরুতে তার পরিমাণ বেশি। অন্তত মোটামুটি ছোট আয়তনের এক জায়গায় তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিক্রম যে সেই দক্ষিণ মেরুতেই নেমেছে, তার মূলে ওই জল।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন সাগর-মহাসাগর ফেলে খামোকা চাঁদের জলে আমাদের কী দরকার? দরকার আছে। আজ হয়তো নেই, ভবিষ্যতে হতে পারে। কারণ চাঁদে গিয়ে হয়তো একটা বসতি গড়বে মানুষ। যে বৃত্তান্ত এত দিন গল্পে পড়ে এসেছি, আজ তা সত্যি হতে চলেছে। চাঁদ থেকে পাওয়া যেতে পারে নানা জরুরি খনিজ পদার্থ, সেগুলো হাতে পেতে গেলে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে কাউকে না-কাউকে। চাঁদে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করে হয়তো পৃথিবীতেও পাঠানো হতে পারে। আরও দূর মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার জন্য চাঁদে বসানো হতে পারে লঞ্চপ্যাড। কারণ, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টান অনেক কম বলে সেখান থেকে রকেট ছুড়তে কম শক্তি খরচ করতে হয়। যা-ই আমরা করতে চাই, সবার আগে সেখানে থাকার জায়গা গড়তে হবে, আর সে জন্য অবশ্যই লাগবে জল। তা ছাড়া জলটাকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে ভেঙে ফেললে সেখানকার রকেটে জ্বালানির সমস্যাও মিটবে।

চন্দ্রযান-৩-এর অন্য অনেক কাজের মধ্যে একটা বড় কাজ এটাই। চাঁদে নামার পর থেকে ১৪ দিন— অর্থাৎ টানা যে ক'দিন সূর্যের আলো পাওয়া যাবে, প্রজ্ঞান আর বিক্রম নানা ধরনের নজরদারি চালাবে। খনিজ কী আছে, জল আছে কতটা, চাঁদের মাটির কাছাকাছি আবহাওয়া কেমন— এই সমস্ত। সেই সব তথ্য পৃথিবীতে বসে বিশ্লেষণ করবেন গবেষক বিজ্ঞানীরা। বলা যায় না, চাঁদ সম্পর্কে আমাদের জানায় যেটুকু অন্ধকার আছে, তার অনেকটাই কেটে যেতে পারে তার ফলে। আর এও জানি, তোমরা যে দিন নতুন করে চাঁদের ইতিহাস লিখবে, তাতে খুব বড় করে লেখা থাকবে চন্দ্রযান-৩ অভিযানের কথা।

চাঁদের সোজা ও উল্টো পিঠ। উল্টো পিঠে গহ্বর কম

ফটো: আইস্টক, উইকিমিডিয়া কমন্স

মস্তান বোমকাই

উল্লাস মল্লিক

বোমকাইয়ের মনে যে বড় দুঃখ। দুঃখে দুঃখে একেবারে সিলিন্ডার ভর্তি। দুঃখের চাপে মাঝে মাঝে সিলিন্ডার লিক করে একটু-আধটু বাইরে চলে আসে। তখন তার গা থেকে দুঃখ দুঃখ গন্ধ ছাড়ে। লোকজন বলে, "কী রে বোমকাই, কিসের দুঃখ তোর, মুখটা অমন করে আছিস কেন? খাওয়া দাওয়া হয়নি, নাকি বাপ বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে?"

না, বাপ তাকে খেদিয়ে দেয়নি এখনও। বলতে নেই, ভাল ব্যবহারই করেন। তবে ওই, মাঝে মাঝেই কী ভাবে যেন সেই কুটকুটে প্রসঙ্গটি তুলে ফেলেন। চাকরি। বাবা বলেন, "এ বার চাকরিবাকরির একটা চেষ্টা কর। আমি তো আর সারাটা জীবন থাকব না।"

বোমকাই চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কী! বলে বলে তো বাবাকে বোঝানো যায় না, ঠুনকো চাকরিবাকরি করার জন্য জন্ম হয়নি তার। সে চায় মস্তান হতে। হ্যাঁ মস্তান। তার নামে এলাকা কাঁপবে। কালো জিন্স, কালো হাতকাটা গেঞ্জি আর কালো সানগ্লাস পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, সন্ত্রমে দু'পাশে সরে দাঁড়াবে সবাই। ফুটবল

খেলা দেখতে গেলে টিকিট কাটার কোনও ব্যাপারই থাকবে না। কর্মকর্তাদের কেউ এক জন একটা চেয়ার সাইডলাইনের ধারে পেতে দিয়ে বলবে, "বসুন বোমকাইদা।"

ব্যাগ নিয়ে বাজারে গেলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। তার হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে আলুওয়ালা আলু ঢুকিয়ে দেবে। আলুওয়ালার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সব্জিওয়ালা সেরা সেরা সব্জিগুলো ভরে দেবে ব্যাগে। মাছের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে ছুটবে মাছওয়ালা। আড়াই কিলোর কাতলা ঢুকিয়ে দেবে ব্যাগে। ব্যাগ ছাপিয়ে মাছের লেজ উঁকি দেবে বাইরে। তার পর হয় তো এক দিন লক্ষ্মণপুর তিন মাথার মোড়ে গিয়ে দেখল, বিরাট গন্ডগোল। দু'দলের ঝামেলা লেগেছে। পুলিশ কিছু করতে পারছে না। ঠিক সেই সময় অকুস্থলে পৌঁছোল বোমকাই। ডান হাতটা আম্পায়ারের 'বাই' দেখানোর মতো উপরে তুলল। ব্যাস, ঝামেলা খতম। হাঙ্গামা থামিয়ে দিল দু'দলই। দলের ক্যাপ্টেনরা এসে বলবে, "বোমকাইদা, তুমিই একটা বিচার করে দাও।"

বোমকাইয়ের বিচার নতমস্তকে মেনে নেবে দু'পক্ষই। পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বলবেন, "বোমকাইবাবু, প্লিজ় এক বার থানায় চলুন না, একটু কফি খাবেন। আর, আপনি পুলিশে জয়েন করুন না; দেশ ও দশের খুব উপকার হয় তা হলে।"

কফি খেলেও বোমকাই কিন্তু পুলিশে যোগ দেবে না। বোমকাই তো পুলিশ হতে চায়নি জীবনে। মাস্টার, ব্যবসাদার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ডাকপিয়ন কিছুই হতে চায়নি সে। তার জীবনে একটাই লক্ষ্য। মস্তান হবে। পাড়া কাঁপাবে।

আসলে ভাবনাটা মাথায় এসেছিল অনেকদিন আগে। ক্লাস সেভেনে। দুপুরবেলা খড়দা থেকে পিসেমশাই হাজির। রবিবার। মা বললেন, "অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে রাজভোগ নিয়ে আয় চারটে।"

কাজের দায়িত্ব খুশি মনেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল বোমকাই। ও নিশ্চিত জানত, প্লেটের চারটে রাজভোগ খাবেন না পিসেমশাই। বড় জোর দুটো। তার পর তিনি ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেই একটা মুখে চালান করে দেবে বোমকাই। কিন্তু সে দিন মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তোতনদার মুখোমুখি। সবাই জানে, তোতনদা বিরাট মস্তান। ইয়া লম্বা, চওড়া বুক, চোখ রক্তবর্ণ। সারা গায়ে গুলগুলে মাস্‌ল একেবারে ঠেলাঠেলি করছে। যাকে বলে একেবারে পাঠান চেহারা। তোতনদা ডাকল তাকে, "অ্যাই শোন এ দিকে।"

তোতনদা ডেকেছে যখন, যেতেই হয়। ভয়ে ভয়ে সামনে গেল বোমকাই।

"কী নিয়ে যাচ্ছিস?"

বোমকাই ভয়ে ভয়ে বলল, "রাজভোগ।"

"এখন রাজভোগ কে খাবে?"

"পিসেমশাই।"

"দেখি দেখি," বলে বোমকাইয়ের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা এক রকম ছিনিয়েই নিল তোতনদা। তার পর প্যাকেট খুলে বলল, "জয় মা তারা, এ তো এক একটা পেটোর সাইজ়! তোর পিসেমশাইয়ের যা চিমড়ে চেহারা, তাতে এ রাজভোগ হজম করতে পারবেন না।"

বোমকাই মিউ মিউ করে বলল, "আমার পিসেমশাইয়ের চিমড়ে চেহারা নয়।"

"চিমড়ে নয় তো কী হয়েছে? এই রাজভোগ খেলে তিন দিনের মধ্যে চিমড়ে হয়ে যাবেন। তোর পিসেমশাইয়ের ভালর জন্যেই অবেলায় এই রাজভোগগুলো কষ্ট করে খেতে হচ্ছে আমায়। পিসেমশাইকে বলিস, যেন প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেন।"

শুকনো মুখে বাড়ি ফিরে এসেছিল বোমকাই। বাবা শুনে রেগে অগ্নিশর্মা। পুরনো একটা ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, "শুনেছিলাম বটে, বঙ্কুবাবুর ছেলেটা কিছু দিন হল ত্যাঁদড়ামি শুরু করেছে। আজ ওর এক দিন কী আমার এক দিন!"

শুনে বোমকাইয়ের টেনশন। সম্মুখ সমরে কার জয় হবে। মন বলছে, বাবা, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি বলছে, তোতনদা ছাতার বাঁটে কাবু হওয়ার বান্দা নয়।

যাই হোক, যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত লাগেনি। কিছু ক্ষণ পর অক্ষত ছাতা আর রাজভোগ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বাবা। বাবার দাবি, তোতনদা গলির মুখে নাকি আঙুল চাটছিল। বাবাকে দেখেই কেমন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সে দিন থেকেই শপথ নিয়েছে বোমকাই। বড় হয়ে মস্তান হবে। পাড়া কাঁপবে তার নামে। কিন্তু হবে বললেই তো হওয়া নয়। তার জন্যে মেহনত লাগে। মনবাসনাটা প্রথম প্রকাশ করে জিগরি দোস্ত ছোটকুর কাছে। ছোটকু শুনে প্রথমে তো খুব অবাক। তার পর বলে, "সত্যি!"

বোমকাই বলে, "নয়তো কী!"

ছোটকু বলল, "আমার বন্ধু মস্তান হবে, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। শোন তোকে প্রথমেই একটা কাজ করতে হবে। আমাদের বাড়িওয়ালাটা হেবি শয়তান, মাঝে মাঝে জল বন্ধ করে দেয়, টাইট দিতে হবে ব্যাটাকে।"

তবে ছোটকু একটা ফ্যাকড়া তুলল। বলল, "কিন্তু তোর এই পেঁকুলে চেহারা, এতে হওয়ার নয়। একটু হোমরাচোমরা বডি বানাতে হবে। বডি বানাতে হলে জিম করতে হবে আর ছোলা গুড়।"

ছোটকুর উপদেশ মতো সঙ্ঘশ্রী ব্যায়াম সমিতিতে নাম লেখাল বোমকাই। কিন্তু জিম কপালে সইল না। এক দিন বারবেল চাগাতে গিয়ে হাত ফস্কে পড়ল পায়ে। থেঁতো হয়ে গেল পায়ের পাতা। একটা আঙুলের হাড় ভাঙল। সুস্থ হতে আড়াই মাস। সেরে ওঠার পর নাক-কান মলে বিদায় জানাল জিমকে। ব্যাপার দেখে ছোটকু বলল, "চিন্তা নেই। জিমটিম বাদ দে। মস্তানের আসল শক্তি হল মেশিন।"

শুনে একটু অবাক হয়ে গেল বোমকাই। মেশিন দিয়ে কী ভাবে লোকজনকে চমকানো যাবে? ওই বিশাল জিনিসটা কি ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরতে হবে রাস্তায় রাস্তায়। বিশেষ করে ওটা নিয়ে অলিতে-গলিতে কাউকে চেজ় করা বেশ চাপের ব্যাপার। তাদের বাড়িতেই একটা সেলাই মেশিন আছে। বহু পুরনো মেশিন। মা মাঝে মাঝে চালান। কিন্তু ওটার মধ্যে ভীতিপ্রদ তো কিছু নেই। তার অজ্ঞতা দেখে হাসল ছোটকু। বলল, "ওরে হাঁদা, এ মেশিন সে মেশিন নয়। এ মেশিন থেকে আগুনের গুলি ছোটে। চালাতেও হবে না; কোমরে গোঁজা থাকলেই পাবলিকের হাঁটু কাঁপবে।"

বোমকাই বলল, "বলিস কী! তুই কি পিস্তল, রিভলভারের কথা বলছিস?"

"ইয়েস।"

বোমকাইয়ের পেটের ভিতরটা গুড় গুড় করে উঠল।

॥ ২ ॥

আজ বোমকাই অকুতোভয়। কারণ তার হাতে মেশিন। আসল নয় যদিও। কিন্তু দেখতে ডিটো আসলের মতো। সে দিনের

সেই ক্লাস সেভেনের বোমকাই আজ বাইশ বছরের যুবক। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছে অনেক দিন, কিন্তু আজও মস্তান হতে পারেনি। কারণ মেশিন জোগাড় করে ওঠা হয়নি তার। সে দিনের সেই তোতনদা আজ আর মস্তানি করতে পারে না। মস্তানি করবে কী, দাঁড়াতেই পারে না ভাল করে। এক বার হনুমানের ভয়ে পাঁচিল থেকে লাফ দিতে গিয়ে কোমরে মারাত্মক চোট পায়। সেই থেকে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না। সকাল, সন্ধে বাবার মুদির দোকানে বসে হিসেবের খাতা লেখে। তার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মস্তান হওয়ার ইচ্ছেটা বুকের মধ্যে ওত পেতে আছে। শুধু একটা মেশিনের অপেক্ষা। ব্যস, ডান। মেশিন জোগাড় করার চেষ্টা যে করেনি বোমকাই, তা-ও নয়। ছোটকু এক বার কোথা থেকে খবর আনল, পাড়ায় পাড়ায় যে সব টিনভাঙা-লোহাভাঙাওয়ালা আসে, তাদের কেউ কেউ বিক্রির জন্যে সঙ্গে মেশিন রাখে। তক্কে তক্কে থাকতে হবে শুধু। কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলতে হবে, গুডুম আছে নাকি। তেমনই একটা লোকের খোঁজ এক দিন পেয়েছিল বোমকাই। সে 'গুডুম' দেবে বলে পঁয়ত্রিশ টাকা অ্যাডভান্সও নিয়েছিল। কথা ছিল দু'দিন পর রাত ঠিক ন'টার সময় দক্ষিণ কালীমন্দিরের পিছনে জিনিসটা হস্তান্তর হবে। সন্ধের পর জায়গাটা নির্জন। একটু বুক টিপ টিপ করছিল বোমকাইয়ের। কিন্তু একটু পরেই যার হাতে মেশিন উঠে আসবে, যার দাপটে এলাকা কাঁপবে, তার অন্তত সামান্য অন্ধকারকে ভয় পেলে চলে না। মা কালীর নাম নিয়ে মন্দিরের পিছনে পৌঁছে গেল সে। তিন-চারটে কুকুর আর ঝাঁক ঝাঁক মশা... এ ছাড়া কেউ কোথাও নেই। ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেল বোমকাই। মেশিনওয়ালার টিকির দেখা নেই। কিন্তু কুকুরগুলোর হঠাৎ কী হল কে জানে; প্রবল রবে প্রতিবাদ শুরু করল। মেশিনের মায়া ত্যাগ করে সে দিন চম্পট দিয়েছিল বোমকাই। সেই মেশিনগুলোর খোঁজ আজও পায়নি সে। মাঝখান থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা জলে গেল।

হঠাৎ হাতে চলে এল সেই ব্রহ্মাস্ত্র। গত কাল কানাইগড়ে বন্ধু সুব্রতর বাড়ি গিয়েছিল বোমকাই। ওর ঘরে টেবিলের উপর পড়ে ছিল অস্ত্রটা। দেখেই চমকে ওঠে বোমকাই। ঠিক এই জিনিসটাই তো খুঁজছে সে। পুলিশ-গোয়েন্দা-গ্যাংস্টারের হাতে এই জিনিসের ফটোই তো দেখে এসেছে এত কাল। সুব্রতর কাছ থেকে জানতে পারল, কিছু দিন আগে পাড়ার নাটকে মস্তানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে। ওটা সেই জিনিস। সুব্রতর কাছ থেকে জিনিসটা চেয়ে এনেছিল বোমকাই। সুব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করবি তুই!"

বোমকাই বলেছিল, "আমিও পাড়ার নাটকে মস্তানের অভিনয় করছি।"

সেই মেশিন নিয়ে আজ বেরিয়েছে বোমকাই। কোমরে গোঁজা। তার উপর দিয়ে পরেছে জামাটা। দরকার মতো বের করবে। বকুলতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল বিজন হালদারের সঙ্গে। বাজারে বিজন হালদারের কেক-পেস্ট্রির দোকান। এক বার একটা পচা কেক গছিয়েছিল বোমকাইকে। তখন মেশিন ছিল না বোমকাইয়ের কাছে। তাই ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আজ বোমকাইয়ের মনে হল একে দিয়েই শুরু করা যাক। সে সোজা গিয়ে মেশিনটা ঠেকাল বিজন হালদারের ঘাড়ে। চাপা গলায় বলল, "নড়াচড়া করলেই গুডুম।"

বিজন হালদার মস্ত একটা হাই তুলে বললেন, "আরে খামোকা কাতুকুতু দিচ্ছিস কেন!" তার পরেই এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বোমকাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নিলেন মেশিনটা। হতভম্ব বোমকাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বিজন হালদার মেশিনটা ছুড়ে মারেন বোমকাইকে। বলেন, "ছোঃ,ছোঃ...শেষ পর্যন্ত নকল!"

মন খারাপ হয়ে যায় বোমকাইয়ের। দেখেই বুঝে গেছে নকল! কী করে হয়? সে তো একটুও বুঝতে পারেনি। তা হলে কি সবাই বুঝে যাবে? কেউ ভয় পাবে না? ভাবতে ভাবতে বাসস্ট্যান্ডে চলে এল বোমকাই। বাসস্ট্যান্ড খুব ফাঁকা আজ। নাকি বাস ধর্মঘট চলছে। ইতি-উতি কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। যেন তীর্থের কাক। ট্যাক্সি কি অটো কিছু-একটা পেলেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ইচ্ছেমতো রেট হাঁকছে ড্রাইভাররা।

দূরে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখল বোমকাই। দেখেই প্ল্যানটা মাথায় চলে এল। এগিয়ে গেল ট্যাক্সিটার দিকে। হাত দেখিয়ে দাঁড় করাল ট্যাক্সি। মাঝবয়সি ড্রাইভার বললেন, "কোথায় যাবেন?"

এ বার চিন্তায় পড়ে গেল বোমকাই। এখন কোথায় আর যাবে সে; কোথাও তো যাওয়ার নেই তার। এত দিনের স্বপ্নটা ওই পচা কেকওয়ালা ভেঙে চুরমার করে দিল।

ড্রাইভার তাগাদা দিলেন, "কী হল কোথায়!"

বোমকাইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "চন্দনপুর।"

কেন যে চন্দনপুর বেরিয়ে এল কে জানে! চন্দনপুরে মামার বাড়ি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। মা মাঝে মাঝেই যেতে বলে; কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। যাই হোক মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে যখন, কিছু করার নেই। ড্রাইভার বললেন, "পাঁচশো টাকা লাগবে।"

পাঁচশো! খুব অবাক হয়ে বোমকাই বলে, "দুশোর বেশি হতেই পারে না।"

ড্রাইভার এ বার একটু উগ্র ভাবে বলে উঠলেন, "না না, রেট এক; উঠতে হয় উঠুন, না হলে ছাড়ুন..."

আর দেরি করে না বোমকাই। মেশিনটা বের করে ড্রাইভারের কপালে ঠেকায়।

"বাপরে বাপ," বলে এমন আঁতকে ওঠেন ড্রাইভার যে, বেখেয়ালে হর্নে হাত পরে যায়। ভ্যাক ভ্যাক করে দু'বার হর্ন বেজে ওঠে।

বোমকাই চাপা গলায় বলে, "খুলি উড়িয়ে দেব কিন্তু।"

ড্রাইভার বললেন, "স্যর, যাবেন তো ভাল কথা, বসে পড়ুন আর জিনিসটা লুকিয়ে ফেলুন। না হলে,অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। আপনার যা ইচ্ছে দেবেন। না ইচ্ছে হয়, না দেবেন।"

ট্যাক্সির পিছনের সিটে গা এলিয়ে বসে পড়ে বোমকাই। মনে ফুরফুরে আনন্দ। যাক, মিশন সাকসেসফুল। কিন্তু দুশো টাকাই বা দেবে কোথা থেকে। পকেটে গোটা পঁচিশ-তিরিশ টাকা পড়ে আছে। এ দিকে কথা হয়েছে দুশো। মস্তান হওয়া যখন হয়ে গেছে, তখন চুক্তির টাকাটা দেওয়াই উচিত। যাই হোক, মামার বাড়ি পৌঁছে দিদার কাছ থেকে নিয়ে দিয়ে দেবে। মামার বাড়ি গেলে দিদা তো এমনিতেই টাকা দেয়।

দেখতে দেখতে তালবাগান মোড়ে চলে এসেছে গাড়ি। লম্বা মতো এক জন মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছে। বাস বন্ধ বলে এও মনে হয় বেকায়দায় পড়েছে। বোমকাই গাড়ি থামাতে বলল ড্রাইভারকে। গাড়ি থামতেই লোকটা এগিয়ে এল। বলল, "চড়কতলা যাবে?"

চন্দনপুর যাওয়ার পথেই চড়কতলা। বোমকাই বলল, "উঠে আসুন।"

লম্বু বলল, "কত?"

বোমকাই বলল, “যা ইচ্ছে।”
লোকটা একটু অবাক চোখে তাকাল বোমকাইয়ের দিকে। তার পর ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়ল। গাড়ি ছুটল আবার। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা।

এ বার পঞ্চাননতলা মোড়। বোমকাই দেখল একটা ছেলে রাস্তার ধরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। বয়স আন্দাজ পনেরো-ষোলো। তারই পাশে মাটিতে উবু হয়ে বসে পক্ককেশ এক বৃদ্ধ।

বোমকাইয়ের নির্দেশমতো গাড়ি থামল। ছেলেটি জানাল, ওই বৃদ্ধ তার দাদু; শ্বাসকষ্টে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। পাড়ার ডাক্তারবাবু বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কিন্তু এখন দেখছে বাস বন্ধ।

বৃদ্ধ আর নাতিকে তোলা হল গাড়িতে।

লম্বু বলল, “আমার তা হলে কী হবে!”

বোমকাই বলল, “আগে হাসপাতালে যাব, আপনি এখানে নেমে যেতে পারেন। অথবা আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।”

লোকটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, “দুর বাবা, এ তো মহা ফ্যাচাংয়ে পড়া গেল। আমাকে কিন্তু চড়কতলায় ঠিক নামিয়ে দিতে হবে।”

গাড়ি ছুটল হাসপাতালের দিকে। কিন্তু কিছুটা গিয়েই প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার! ড্রাইভার বললেন, “দাঁড়ান দেখছি।”

তার পর কত রকম ভাবে চেষ্টা করল ড্রাইভার। কিন্তু কিছুতেই স্টার্ট নিল না গাড়ি। ড্রাইভার মাথা চুলকে বললেন, “মনে হচ্ছে, ইঞ্জিনে বড় গোলমাল। মেকানিক ডাকতে হবে।”

লম্বু এ বার রেগে কাঁই। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, “কী কুক্ষণেই এই গাড়িতে উঠেছি রে বাবা। এর চেয়ে হেঁটে চলে যাওয়া অনেক ভাল।”

লাফিয়ে বোমকাই নামল গাড়ি থেকে। সোজা লম্বুর সামনে গিয়ে বলল, “আরে যাচ্ছেন কোথায়?”

লম্বু বলল, “কোথায় আবার, বাড়ি। গাড়ির যা ছিরি আপনাদের। এখন দেখছি হেঁটেই যেতে হবে।”

“আরে, বাড়ি পরে যাবেন। এখন তো আপনাকে গাড়ি ঠেলতে হবে।”

“মানে!” ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে লম্বুর।

“মানে, ওই দাদু খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু গাড়ি তো খারাপ। তাই ঠেলতে হবে। আপনি ঠেলবেন, আমি ঠেলব, নাতিও ঠেলবে। দাদু থাকবেন গাড়ির ভিতর আর ড্রাইভার ধরে থাকবে স্টিয়ারিং। ঠিক আছে?”

লম্বু বেশ জোরেই বলে উঠল, “ইয়ার্কি নাকি; আমি গাড়ি ঠেলতে পারব না।”

বোমকাই চকিতে জিনিসটা বের করে লম্বুর কপালে ঠেকায়। বলে, “আমার নাম বোমকাই; আমার নামে বোম আর, হাতে মেশিন। দশ গুনব। ওয়ান-টু-থ্রি...”

লম্বু বলে উঠল, “আরে গাড়ি ঠেলা নিয়ে কথা ! কী আর এমন; কত ঠেলেছি ! চলো, চলো, আর হাতের যন্তরখানা সরাও তো ভাই কপাল থেকে।”

প্রবল আনন্দে বাতাসে একটা গুলি ছুড়তে যাচ্ছিল বোমকাই। তার পরে মনে হল, ইস কেলেঙ্কারি করেছিল আর কী!

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

মজার ঝাঁপি

অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা

বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

মোবাইল ফোন থেকে দূরে সরিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুটবল খেলার আগ্রহ তৈরি করতে অনেক দিন ধরেই কাজ চলেছে বেহালার নেতাজি সুভাষ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল তাদের বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। খুদেদের অভিভাবকদের সঙ্গে সে দিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা কেয়া সিংহ, বিশিষ্ট ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অরিন্দম ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী দত্ত, মহিলা ফুটবলার আলপনা শীল এবং কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, ফুটবল-কোচ সঞ্জয় সেন এবং নিমাই দত্ত। এই কোচিং সেন্টারে ৬ থেকে পনেরো বছর বয়সিদের ফুটবল কোচিং দেওয়া হয়। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান ভাবে ফুটবলের প্রশিক্ষণ পায়। চলতি বছরে এই ক্লাবের ছাত্রীরাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত ‘কন্যাশ্রী ফুটবল ম্যাচ’-এ সাফল্য পেয়েছে। এই বছর স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের পাশাপাশি বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্টের অনুষ্ঠান হয় বেহালার নব তরুণ সঙ্ঘের মাঠে। সংস্থার পক্ষ থেকে দশ জন প্রতিভাবান দুঃস্থ বাচ্চাদের হাতে খেলার সরঞ্জাম, পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হয়। ছিল ‘বসে আঁকো প্রতিযোগিতা’ও। একশো দশটিরও বেশি জুনিয়র ফুটবল উৎসাহীরা (মেয়েরাও) এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বর্তমানে এই ফুটবল ক্লাবটি তাপস ঘোষের মতো প্রশিক্ষিত কোচের সাহায্যে প্রায় কুড়ি জন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে ছেলেমেয়েদের পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এই সংস্থা থেকে খেলোয়াড়রা বিভিন্ন জায়গায় সাফল্য পেয়েছে এবং পাবেও আশা করা যায়।

প্রকৃতিপাঠের বুদ্ধিদীপ্ত ছড়া

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সবুজ ঘাসে উড়ো খই’ বইটির প্রচ্ছদটি ভারী মজাদার। কিন্তু বইটি শুধুই মজার নয়, সেটি ছড়ার বইয়ের কয়েকটা পাতা ওলটালেই বোঝা যায়।।

বইটির প্রচ্ছদ

‘সাঁত্রাগাছির ঝিল’ ছড়াটি। ‘পুকুর বা জলাজমি/ বিল-খাল-ঝিল/পোকা মাছ উদ্ভিদে/ করে কিলবিল। সাঁত্রাগাছির ঝিলে/ পরিযায়ী পাখি/ সাইবেরিয়াকে ভুলে/ ঘর বাঁধো নাকি!’ — তাঁর ছড়ায় যেমন মজার হুটোপাটি, তেমনি আছে প্রকৃতিপাঠের এক নির্মল আবেদন। কখনও খানিক রাগত কণ্ঠে কখনও কৌতুকভরে তিনি শিশুপাঠ্য ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন পরিবেশচেতনার পাঠ। সঙ্গে রয়েছে ছিমছাম অলঙ্করণ। তবে কোথাও কোথাও ব্যাকরণে ছন্দপতন ঘটেছে, সেটুকু না হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত।
দাম:১৩৫ টাকা, প্রকাশনা: সুমিত্রা

পাঠভবন ডানকুনি

শিক্ষার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের দিকে খেয়াল রেখে চলেছে হুগলির এই স্কুলটি।

কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাছপালায় ছায়ায় ঘেরা এই স্কুলটির পরিবেশ ভারী চমৎকার। স্কুলের সামনে বিশাল খেলার মাঠ ও লাগোয়া একটি স্থায়ী মঞ্চ রয়েছে। ১৯৯২ সালের অগস্টে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন উমা সেহনাবীশ, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, রত্না দাস প্রমুখ। তখন ন'জন শিক্ষিকা ছিলেন। মোট সব ক্লাস মিলিয়ে একশো ছাত্রছাত্রীও ছিল না। ২০০২ সালে শিক্ষা দফতরের অনুমোদন মিলেছিল। এখন এখানকার প্রধান শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। মন্টেসরি ও প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা দর্পণা সিংহ। দর্পণাদেবী বললেন, তখন এখানকার কোল ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা চাইতেন, একটা ভাল বাংলা মাধ্যম স্কুল হোক। সেই জন্য তাঁরা কলকাতায় উমাদির কাছে যান। প্রথমে এটি ছিল একটি শপিং কমপ্লেক্স। সেজন্য ঢুকলে একটু অবাকই লাগে। স্কুলের নানা ব্যতিক্রমী প্রয়াসের মধ্যে একটি, পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের জন্য স্কুলে বৃহস্পতিবার একটি খোলামেলা আলোচনার আসর। স্কুলসহ অন্য যে-কোনও স্কুলের ছাত্ররা আসতে পারে। সেখানে নিজেদের মধ্যে আলাপের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের গাঁথুনি মজবুত করা হয়। সামাজিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা খুব গতিশীল। সেপ্টেম্বরে একটি শিক্ষামূলক সার্ভে হওয়ার কথা। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে গেলে অন্য বোর্ডের তুলনায় কোন দিকে স্কুল পিছিয়ে, সেই প্রসঙ্গগুলো উঠে আসবে সেই সমীক্ষায়। স্কুলটি বাংলা মাধ্যম সহ-শিক্ষার স্কুল হলেও প্রথম থেকেই ইংরেজি-বাংলা দুটো ভাষাই গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। কোভিডের পরে বাচ্চারা আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য নিচু ক্লাসের ছাত্রদের স্কুলেই ছবি দেখানো ব্যবস্থা আছে। ক্লাস সিক্স থেকে রয়েছে থেকে কাউন্সেলিং ক্লাসের ব্যবস্থা। শুক্রবার শেষ ক্লাসটা নিজেদের সব রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারে পড়ুয়ারা। তাদের কথার প্রেক্ষিতে অভিভাবকদের সঙ্গে বিশেষ দরকারে কথা বলাও হয়। দর্পণা সিংহ জানালেন, পাঠভবনের বিশেষত্ব হল মন্টেসরি বিভাগের পড়াশোনা। কোনও বাচ্চা ব্যাগে বই নিয়ে আসে না। যে-কোনও আকার নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে চেনে। তার পর নামটি শেখানো হয়। ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এ রকম চাপমুক্ত শিক্ষানীতিতে কুঁড়ি থেকে ফুলে পরিণতিতে ওদের সাহায্য করে স্কুল। আর হ্যাঁ সেজন্যই বোধ হয় স্কুলের সেকশনের নাম সব ফুলের নামের— যেমন তৃতীয় শ্রেণির সেকশনের নাম পারুল, পারিজাত ও পলাশ। প্রতিটি ক্লাসেই এমন রীতি। স্কুলে চারটি হাউস আছে—ঐক্য, শক্তি, মৈত্রী, সাম্য। তারা স্কুলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা-সহ নানা ধরনের কাজ করে। বছরের শেষে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। গত বছর সাম্য হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের ভারী সুন্দর সংযোগ শেখানো হয়। কেউ না এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের খবর নেওয়া হয়। এ ভাবেই তাদের এক সঙ্গে বাঁচার শিক্ষায় দীক্ষিত করে স্কুল। এখন স্কুলে সাড়ে বারোশো ছাত্রছাত্রী সংখ্যা। মোট শিক্ষিক-শিক্ষিকা ও অ-শিক্ষক কর্মী মিলিয়ে স্কুলে ছিয়াত্তর জন দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন। স্কুলে মন্টেসরি, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি বিভাগ রয়েছে।

ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ফিজিক্স ল্যাবে পড়ুয়ারা

স্কুলের ছাত্রছাত্রী

স্কুলের লাইব্রেরিতে বইয়ে মগ্ন পড়ুয়ারা

উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে পড়াশোনা করা হয়। আসা যাক, স্কুলের রেজ়াল্ট প্রসঙ্গে। '২৩ সালে মাধ্যমিক দিয়েছিল ৯৫ জন। তার মধ্যে ৬৫ জন ফার্স্ট ডিভিশন ও ৩৮ জন স্টার মার্কস এবং ৩২ জন নব্বই শতাংশের উপর পেয়েছে। সুপ্রীতি দেবনাথ পেয়েছে সর্বাধিক নম্বর—৬৭৪। একই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৩১ জনের মধ্যে প্রথম বিভাগে সবাই পাশ করেছে। সাত জন স্টার নম্বর পেয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৪৩৫। একাদশ-দ্বাদশ বিভাগে এই স্কুলে উনিশটি বিষয় আছে। ফিজ়িক্স, অঙ্ক, সাইকোলজি, ভূগোল, কেমিস্ট্রি, নিউট্রিশন এবং দুটো কম্পিউটারের ল্যাবরেটরি রয়েছে। এখানে প্রথম শ্রেণি থেকে কম্পিউটার, গান, লাইব্রেরি, পিটি ক্লাস পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। লাইব্রেরিতে কয়েক হাজার বই, টেক্সট বইয়ের সঙ্গে গল্পের বইও ঠাসা। কসমোলজির উপর কেমব্রিজে গবেষণা করতে যাচ্ছে শাশ্বত দাশগুপ্ত নামে এক প্রাক্তন ছাত্র। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে চিকিৎসক, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীও আছে। স্কুলে সারা বছরই চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দোলের সময় বসন্তোৎসব, মন্টেসরির পড়ুয়ারা তো রথও টানে। তার পর স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস—১০ অগস্ট। সে দিন বৃক্ষরোপণও হয়। 'ওই দিন আমরা সকলেই পাঠভবন হয়ে উঠি'— পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর বয়ান পাওয়া গেল। বিদ্যালয়ের জন্মদিন মানে তো সকলেরই জন্মদিন! এতটাই একাত্মবোধ পড়ুয়াদের, দেখে বিস্ময় লাগে। বছরের শেষে একটি প্রদর্শনী হয়। সব ছাত্রছাত্রী সব অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। দু'বছর অন্তর স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়—ঋত। শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে লেখা বা ছবি প্রকাশিত হয়। হালে অনলাইনে শুরু হয়েছে ওয়েবসাইট—বাচ্চাদের লেখা, আঁকাগুলো আর্কাইভ করা হচ্ছে। সম্প্রতি 'টেলিগ্রাফ এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'-এ পশ্চিমবঙ্গের চারটি সেরা স্কুলের একটি হয়েছে ডানকুনি পাঠভবন। এ ছাড়া আরও বারোটি বিভাগ, যেমন শুটিং, নাচ প্রভৃতি বিভাগেও পুরস্কার এসেছে। সঞ্চয়িতা অধিকারী নামে স্কুলের ছাত্রী জাতীয় স্তরে ব্যাডমিন্টন খেলেছে। পঞ্চম শ্রেণির সৈকত ঘোষ জাতীয় স্তরে যোগব্যায়ামে অংশ নিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিরই সুকৃত পাত্র জেলাস্তরে ক্রিকেট খেলেছে। অষ্টম শ্রেণির দেবাঙ্গনা পাত্র রাজ্য স্তরে কবাডি খেলেছে। এ ছাড়া দাবা, ফুটবল, ক্যারাটে, শুটিং, জিমন্যাস্টিক, সাঁতার, গান, নাচে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রচুর পুরস্কার এনেছে। এ বছরই সেপ্টেম্বরে ওড়িশায় চার দিনের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া হচ্ছে। স্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা আছে। আগামী দিনে যাতে তাদের জীবিকাগত অসন্তুষ্টি না হয়, তাদের সঠিক পথে চালনার জন্য এখানকার সফল প্রাক্তনীদেরও আনানোর ব্যবস্থা চলছে। বর্তমানে স্কুলবাড়িটি বেশ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেটি সংস্কার করার পরিকল্পনা চলছে। স্কুলে অ্যাকোয়াগার্ড, ক্যানটিন আছে। ইলেকট্রিকের পরিকাঠামো থেকে পানীয় জলের ধার্য মাত্রা— সুরক্ষার সব বিষয়ের প্রতি স্কুল যত্নবান। যত্ন নানা বিষয়ে। প্রধান শিক্ষক জানালেন, আসল কথা হল অ্যাটাচমেন্ট, তার পর পড়াশোনা। যে ডাল শক্তপোক্ত, সেখানে পাখি বাসা বাঁধে। ফলে অসুবিধেটা খুঁজে বের করা দরকার। এ ভাবে শুধু পড়াশোনা

টিফিনে খেলার সময়

হয়, সার্বিক ভাবে পড়ুয়ার মানসিক বিকাশের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে হুগলির এই ঐতিহ্যবাহী স্কুল।

সুদেষ্ণা ঘোষ
ফটো: ইন্দরজিৎ সিংহ

একটা পুতুল, ঠাম্মা আর আইসক্রিম

বিতান সিকদার

কে জি-টু এর এক জন হাম্পটি-ডাম্পটি ম্যাম পুত্তলির গাল দুটো টিপে আদুরে গলায় বললেন, "কিচ্ছু শোনে না, কিচ্ছু পড়ে না, কিচ্ছু লেখে না। হাউ সুইট!"

সামনে অপরাধীর মতো আমি দাঁড়িয়ে। আমতা আমতা করতে গেলাম, “আসলে ম্যাম...”

“নো আসলে স্যর। এ ভাবে চললে কন্টিনিউ করতে পারবে না তো! এখানে খুব প্রেশার। ভেরি সুইট এনিওয়ে...” আবার গাল টিপে দিলেন।

আমি বোঝার চেষ্টা করে চলেছি— পড়া পারেনি বলে বকছেন, রুষ্ট হচ্ছেন, নাকি মিষ্টি দেখতে বলে আদর করছেন?

সম্ভব নয়। মানুষ করা গেল না। পাখিপড়ার মতো করে কাল রাতে সব গিলিয়ে দিলাম, অথচ কিচ্ছুটি না উগরে চলে এল। আমার মেজাজ চড়ছে। রাস্তায় বেরিয়ে চড়া গরমে বাসস্ট্যান্ডে পুত্তলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাস নেই, ট্যাক্সি নেই, অটো নেই, রিকশা নেই। অ্যাপ ক্যাব বাদই দিলাম... ওগুলো ক্যানসেল করার জন্যই চালায়।

ঘেমেনেয়ে একশা। পুত্তলির সেই বোধও নেই। বাপের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা চিপ্স খাচ্ছে। পরীক্ষায় গোল্লা পেয়েও চিপ্স! দিনকাল খুবই খারাপ।

আমাদের সময় হলে, পারতাম আমি? স্কুলে কিছু না-লিখেও মা'র কাছ থেকে চিপ্স আদায় করতে? বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে দু'ঘা দিয়ে নিতেন। মোল্লা নাসিরুদ্দিনে বিশ্বাসী। কলসি ভাঙলে পিটিয়ে আর লাভ কী? আগেই বরং...

ওই দু'ঘা ছিল ইন্টারেস্ট। আসলে প্রিন্সিপালটা বাড়িতে ফিরে দিত। ওই আসল ফেরত পাওয়ার ভয়ে যে কত কিছু ঠিক লিখে আসতাম, লেখাজোকা নেই।

কী দিন গেছে! লোকে বলে স্ট্রাগল... আরে আমাদের সময় আমাদের মতো হাবাগোবার পড়াশোনাটা ছিল স্ট্রাগল।

অথচ তার কোনও ছাপ কি আছে পুত্তলির মুখে? উল্টে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “বাবা, আজ গাড়ি আনোনি?”

এই গাড়ি-বাড়িই মাথাটা খাচ্ছে।

“আজ চল বাড়িতে...” আমি বিড় বিড় করলাম। সব কিছু না-চাইতেও পেয়ে যাচ্ছ কি না, তাই সরায় ধরাকে ধরেছ। জগতে জন্মেই ঘোষণা করে দিল, ‘যত মোবাইল ফোন— সব আমার।’ থাক! সারা ক্ষণ ওই নিয়েই পড়ে থাক।

দত্তবাবুর মা'র আবার অন্য আদিখ্যেতা, “আহা, ওইটুকুন আঙুল দিয়ে অমন ভাবে বর্গ-জ লেখা যায়...”

সবাই তো পারছে। ছোটবেলায় আমাদের মাথায় সর্বজনীন একটা সূত্র পেরেক মেরে ঢোকানো হত, ‘ও পারলে তুই পারবি না কেন?’ সেই উপপাদ্যই এখন আমার মাথায় ঘুরছে। খ্যাঁক করে বললাম, “অন্তরা কেমন সুন্দর সব লিখে এল, আর তুই বাইরের দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়ে দিলি?”

“আমার লিখতে ভাল লাগছিল না,” রাজনন্দিনী যেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ক্রীতদাসকে জবাব দিলেন।

আমার মাথা দিয়ে তখন ঘাম নয়, লাভা গড়াচ্ছে। ছোট্ট তুলতুলে একটা হাত আমার কেঠো হাতে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বিকৃত করে বললাম, “ভ্যালো ল্যাগছিল ন্যা?”

আওয়াজটা কেমন যেন নিজের কানেই দানবিক শোনাল। পুত্তলি আমার মুখের দিকে চাইল, বুঝেই উঠতে পারছে না, কী হয়েছে।

থাক, রাস্তায় আর কিছু বলব না। এখুনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু হলে মুশকিল। অসহায় লাগছে। সন্তান মানুষ করার জন্য উদয়াস্ত খেটেও যদি রোজ স্কুল থেকে শুনতে হয় ধীরে ধীরে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, তখন অসহায় লাগাটা স্বাভাবিক।

গরম লাগছে। একটা টোটো পেলাম। থামিয়ে বললাম, “নিয়ে চলো ভাই। না হয় একটু বেশি পয়সা নিয়ো।”

পুত্তলি টোটোতে উঠে বেজায় খুশি! বলল, “এসি চলবে না বাবা?”

“চুপ কর।”

ধমকটা জোরে হয়ে গেছিল কি না কে জানে, টোটোওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, “বাচ্চাকে ধমকাবেন না, দাদা। ওরা সিসু, ওরা কি বোঝে?”

বুঝলাম ছেলেটি স-শ গুলিয়ে ফেলেছে। তবে তখন আমার মাথায় অন্য চিন্তা। নিজেকেই মনে মনে বলে চলেছি, ‘না, ধমকাব না। আর লাই পেয়ে পেয়ে এ আস্তে আস্তে বাঁদর হয়ে যাবে।’

আমাদের সময় হত, বুঝত। কী সব দিন ছিল! তখন ধমকধামকের ধার-কাছ দিয়েই যেত না কেউ। মাস্টারমশাইদের মন্ত্রই ছিল, ‘হাত থাকতে মুখে কেন!’ তারই মধ্যে কোনও কোনও স্যর লজ্জার মাথা খেয়েও মারধোর করতে পারতেন না। তেমনই ছিলেন লাইফ সায়েন্স স্যর অনুপবাবু। আর পাবি তো পা, ওই লাইফ সায়েন্সেই পঞ্চাশে বাইশ। ব্যস! বাড়িতে খাতা নিয়ে যাওয়ার পর যা হওয়ার সে তো হলই, উল্টে পর দিন মা-ঠাকরুন নিজে একটা বেত কিনে স্কুলে গিয়ে সবার সামনে স্যরের হাতে দিয়ে বলে এলেন, “ও ভাবে হবে না। এটা কাজে লাগান। ভেঙে গেলে বলবেন, আবার কিনে দিয়ে যাব।”

তবে সবাই তো আর অনুপবাবু ছিলেন না। তাঁদের পরিচিতি সব অক্ষরে। পুরো নাম উচ্চারণ করবার অধিকার ছিল না — এস কে এম, টি কে জি, আর কে এস... সব এক-একটা ভয়ঙ্কর বাঘ। ক্লাসে ঢুকে আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নাগাড়ে পেটাচ্ছেন সবাইকে, অথচ তেমন কোনও কারণ নেই। আক্রমণ শেষ করে বিপক্ষের চল্লিশটা সৈন্যকে ধরাশায়ী করে তার পর লসাগু, গসাগু।

কত কিছু মনে পড়ছে। ইতিহাস পরীক্ষা। তখন বিভিন্ন সাল কিসের জন্য

বিখ্যাত লিখতে হত। ঝামেলাটা পাকাল সতেরশো সাত নিয়ে। দ্বৈপায়ন কোনও ক্রমে লাস্ট বেঞ্চের অপূর্বকে জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল। অপূর্ব উত্তরও দিয়েছিল ঠিকঠাকই, আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল। তাড়াহুড়োয় দ্বৈপায়ন শুনল ‘অরণ্যদেবের মৃত্যু হয়েছিল’। হতভাগা তাই-ই লিখে এল। ব্যস, খাতা বেরোনোর পর স্কুলে ধুন্ধুমার। ইতিহাসের স্যর বেত হাতে ছুটছেন। সামনে দ্বৈপায়ন, প্রাণ বাঁচাতে দৌড়চ্ছে, “ভুল হয়ে গেছে স্যর, ভুল হয়ে

গেছে।”

আর ভুল! স্যর ছুটতে ছুটতেই চেঁচাচ্ছেন, “আমি তো পড়েছিলাম চলমান অশরীরী। তুই তাকেও মেরে দিলি?”

মাঝ পথে হেড স্যর ইতিহাস স্যরকে থামালেন। তিনিও ফুঁসছেন, “কী হয়েছে কী কামাখ্যাবাবু?”

“আর বলেন কেন...” ইতিহাস স্যর বৃত্তান্ত শোনালেন। হেড স্যর শুনছেন আর তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে রাবণের মতো হয়ে যাচ্ছে। শেষে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, “আমিও একটাকে খুঁজছি। কী আর বলব আপনাকে, শের শাহ-কে পুরো উত্তর জুড়ে ‘শের সাহা’ লিখে এসেছে...”

পাশ থেকে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি হুস করে বেরিয়ে গেল। আমি বর্তমানে ফিরে এলাম।

“বাবা জানো, মা বলেছে আজ বিকেলে একটা পুতুল কিনে দেবে,” কথাটা বলে পুত্তলি হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে চাইল।

আমি আবারও ফোঁস করলাম, “ওই কর!”

টোটোটা বেশ দাপটের সঙ্গে চলছে। দাপট, দাপট ব্যাপারটাই এখন উঠে গেছে। আমাদের সময় আক্ষরিক অর্থেই জলে কুমির ডাঙায় বাঘ থাকত। স্কুলে মাস্টারমশাই, বাড়িতে মা-ঠাকরুন। সেই মাস্টারমশাইদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্ত স্যর। সাবজেক্টও বাঘা— অঙ্ক। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, কে সি নাগের দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয় হবেন। অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে অঙ্ক করতে দিতেন। এই যদি এই হয়, তবে ওই-এর মামাতো ভাই কী হবে? নে, এ বার তোরা বোঝ!

সে বার পেপার সেট করলেন চিত্ত স্যর। ব্যস, ক্লাসে মড়ক লাগল। ক্লাস কে ক্লাস উজাড়। খাতা যে দিন বেরোল, সে দিন স্কুল জুড়ে হাহাকার। এ কী হয়ে গেল! আশি শতাংশই ফেল। যে কুড়ি ভাগ পাশ করেছে টেনেটুনে, তারা জন্মের মতো শত্রু হয়ে গেল।

আমি পেয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ। এক নম্বরের জন্য ফেল। বুঝেই উঠতে পারছি না, কোন দিকে পালাব। সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুর আগের অবস্থা। যে কোনও মুহূর্তে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।

ওদিকে চিত্ত স্যরের সে কী উল্লাস! মুখে চোখে অদ্ভুত দ্যুতি, এক ঘায়ে সবক’টাকে শুইয়ে দিয়েছেন।

এ নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে না। ভাবছিলাম, এত কাল এতে-ওতে কম পেলেও অন্তত ফেল করিনি কখনও। একটা অঙ্কের উত্তর নিয়ে রীতিমতো দরাদরি শুরু করলাম, “দয়া করুন স্যর, দয়া করুন...”

কিন্তু, চিত্তবাবুর চিত্ত অবিচল। খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, “উঁহু, হবে না। ভাল করে দ্যাখ। দশমিক বিন্দু এক ঘর আগে পড়ে গেছে।”

“স্যর, উত্তরের সংখ্যাগুলো তো সব ঠিক লিখেছি। ছয়-এর মধ্যে অন্তত এক দিয়ে দিন। এ নিয়ে বাড়ি ফিরলে...”

অনুনয়ে কিচ্ছু হল না। মানুষ এতটা নির্দয়ও হয়। আমার সব গেল। মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। পালাব? কোথায়? কোনও কিছু মনে আসছে না। স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি চোখের সামনে দিয়ে অন্য রুটের বাস ধরে মলয় কোথায় জানি চলে গেল। পাদানিতে দাঁড়িয়ে করুণ মুখে বলে গেল, “চললুম, আবার বড় হয়ে দেখা হবে...”

যে যার মতো পালাচ্ছে। নৌকা ডুবছে। আমার গতি নেই। কোথাও জায়গা না পেয়ে সেই শেষমেশ সন্ধের মুখে বাড়ি। তার পর...

মা দোতলায় সিঁড়ির মুখটাতে দাঁড়িয়ে। আমি এক তলায়। খবরটা দিলাম। ব্যস...

মা’র চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন! সঙ্গে সঙ্গে দশ হাত গজিয়ে গেল। এক-একটা হাতে এক-একটা অস্ত্র। ঝাঁটা, খুন্তি, হাতা, হাতপাখা, লাঠি, ছাতা, স্কেল...

নিজেকে কেমন যেন মহিষাসুর-মহিষাসুর লাগছে। মা-ঠাকরুন আমার দশপ্রহরণধারিণী হয়ে গেলেন। আড়ালে যেন বীরেন ভদ্র মহালয়ার সেই জায়গাটা পাঠ করছেন, “রণদুন্দুভি...ইত্যাদি ইত্যাদি!”

সে একবারে ঝড় বয়ে গেল! “আজ তোরই এক দিন কী আমারই এক দিন...”

“বাবু, এসে গেছি,” টোটোওয়ালার কথায় ঘোর কাটল। পাশে পুত্তলি একই ভাবে হাসিমুখ নিয়ে বসে রয়েছে। চিপ্‌সের প্যাকেটটা দেখলাম শেষ করে ফেলেছে। পয়সা মিটিয়ে বাড়ির গেট দিয়ে তাকে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললাম, “ঠাম্মা এত করে রাইমটা কাল পড়িয়ে দিল, আর তুই কিচ্ছু না লিখে চলে এলি?”

আমি আর বাড়ি ঢুকতে পারলাম না। পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে এসে তেতো মুখ করে চা চাইলাম।

হাতে ভাঁড় নিয়ে বসে আছি। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। পুত্তলির মা অফিস থেকে ফিরে যাবতীয় রেজ়াল্ট দেখে কী করবে আন্দাজ করতে পারলেও, পুত্তলির ঠাকুরমা যে কী বলবে তা মোটেও ভেবে উঠতে পারছি না।

মা-ঠাকরুন চির কালই আমার মতো গবেটের আন্দাজের আওতার বাইরে। তাঁর যাবতীয় ধ্যান-মন নাতনিকে ঘিরে। ওইটুকু মানুষটাকে নিয়ে অত বড় মানুষটার চিন্তার অন্ত নেই। সে কী খাবে, কী পরবে, কোথায় যাবে, কী শিখবে...আজ তিনি কী করবেন কে জানে...

অথচ দিব্যি মনে আছে ,ওই অত বছর আগে সেই অঙ্ক পরীক্ষার রেজ়াল্টের দিন তিনি কী করেছিলেন।

আমি তো ভেবেছিলাম মহিষাসুর বধেই পালা শেষ। কে জানত? মারধোর খেয়ে সন্ধেবেলা গণেশের দোকান থেকে কালো জিরে আনতে বেরিয়েছি। ফিরে দেখি বাড়িতে মা নেই। কী হল? কোথায় গেল?

এক ঘণ্টা পরেও ফেরে না, দু’ঘণ্টা পরেও ফেরে না। বাবা অস্থির হয়ে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠে বললেন, “আরও পঁয়ত্রিশ পা!”

শেষে যাবতীয় জায়গায় ফোন করে জানা গেল, তিনি আমার এক দিদার বাড়ি চলে গিয়ে গাল ফুলিয়ে বসে আছেন। সেই রাতে আমি আর বাবা ছুটলাম। দিদার বাড়ি পৌঁছে ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, “এ কী! এরা কারা? এরা এখানে কেন?”

দিদা আন্দাজ করে একটু আদুরে গলায় বলল, “আহা, এক বার না হয় ভুল করেই ফেলেছে। তাই বলে...”

“ভুল? কিসের ভুল? ভুল মানে কী? ফেল? পঁয়ত্রিশ? আমার ছেলে? অঙ্কে পঁয়ত্রিশ? এ আমার ছেলে?”

সে রাত জুড়ে ঘুমের মধ্যে আমি

শুনছিলাম, "আমার ছেলে? অঙ্কে পঁয়ত্রিশ?"

চা-টাও বিস্বাদ লাগল। ভাঁড়টা ফেলে বাড়িমুখো হাঁটা দিলাম।

কত কঠিন জীবন ছিল তখন। তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে আজ আমরা এমন চকচকে হয়েছি। আর এখন? স্কুলে সেই অত্যাচার নেই, বকাবকি নেই, শাস্তি নেই। কত শান্তি! কত আনন্দ করে শেখার জায়গা।

অথচ পুত্তলিকে মোটে বোঝাতে পারলাম না? পড়ত আমাদের মতো পিঠে দু'ঘা। আপ সে সমস্ত ঠিকঠিক লিখে আসত পরীক্ষায়...

দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি অদূরেই তিনি খেলনা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখ দেখে বুঝলাম, কোনও বিকার নেই।

হঠাৎ করে মাথাটা গরম হয়ে গেল। গলা সপ্তমে তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, "খেলছিস? খেলনা নিয়ে খেলছিস? আজ তোরই এক দিন কী আমারই..."

নিমেষে তার ছোট্ট মুখটা করুণ হয়ে গেল। তবে ওতে আমি আর গলছি না। শক্ত করে তার হাতটা চেপে ধরে আর-এক হাত তুলে মারার ভঙ্গিতে গর্জন করে বললাম, "বল কেন লিখিসনি? বল বলছি..."

"অ্যায়..." আমার হাতটা তার পিঠে পড়ার আগেই দোতলার সিঁড়ির মুখ থেকে আমার গর্জন ছাপিয়ে আর-একটা গর্জন ভেসে এল।

আমি ছোট্ট মানুষটাকে টানতে টানতে এক তলায় সিঁড়ির মুখটায় নিয়ে গিয়ে দেখি মা-ঠাকরুন দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে সেই আগুন। তবে সে চোখ পুত্তলির দিকে নয়, আমার দিকে তাক করা।

তিনি নামছেন। আস্তে আস্তে। দৃষ্টি আমার দিকে স্থির।

তিনি নেমে এলেন। আমার হাতটা আপনা থেকেই ছোট্ট মানুষটার নরম হাত থেকে আলগা হয়ে এল। একটু সরে দাঁড়ালাম।

তিনি আমায় কিচ্ছু বললেন না। কিছু বলতেও দিলেন না। শুধু আলতো করে পুত্তলির হাত ধরে আমায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকলেন।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আর শুনতে থাকলাম, একটা অনেক বড় মানুষ আর একটা ছোট্ট মানুষের মধ্যে চলতে থাকা এক অদ্ভুত আলাপ —

"জানো ঠাম্মা, আমি আজ স্কুলে কিচ্ছু লিখতে পারিনি।"

"তাতে কী হয়েছে..."

"জানো ঠাম্মা, মিস বাবাকে বলেছে আমি কিচ্ছু পারি না।"

"মিস কিছু জানেই না..."

"জানো ঠাম্মা, বাবা খুব রেগে গেছে।"

"আমি বাবাকে খুব বকে দেব..."

"বাবা বিকেলে আর পার্কে নিয়ে যাবে না।"

"তাতে কী? আমি নিয়ে যাব তো..."

"দোলনা চড়ব?"

"চড়বই তো..."

"আইসক্রিম?"

"খাবই তো..."

"জানো ঠাম্মা...আজ স্কুলে..."

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

বাঘ ব্রহ্ম খেলা

রূপম ইসলাম

(আগে যা হয়েছে: এরিক দত্ত ওদের সবিস্তারে বলছিলেন, সিডের ভিনগ্রহী যোগাযোগের কথা। তাঁকে থামিয়ে জ্যাক স্পায়ার্স জানাল মিচ বাওয়ার্স নামে এক হ্যাম রেডিয়ো স্পেশালিস্টের সঙ্গেও সিড সময় কাটাত। তাঁর রেডিয়োতেও ভিনগ্রহী সঙ্কেত ধরা পড়তে পারে। এরিক দত্ত বললেন, তাঁর বিশ্বাস সিড ব্যারেট দেখেছিল পৃথিবীর সঙ্গে এক গ্রহাণুর সংঘাত। সিডের আঁকা ছবিগুলো দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে। তিনি আরও বললেন, সিডের আঁকা ছবিগুলোর প্রত্যেকটিরই কোণ ছেঁড়া। কোনও সঙ্কেতের জন্য কি কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে? এসেক্সের ম্যাচিং নামের গ্রামের প্রান্তসীমায় জন চার্টওয়েলের প্রাচীন প্যালেস। জনবিরল চার পাশ। প্রাসাদটিতে ঢুকে আশ্চর্যের 'ভূতের বাড়ি'ই ঠাহর হল প্রথমে। তবে অভিজাত ও প্রাচীন আসবাবে ঠাসা বাড়িটিতে ঢোকার পর জনের হাবভাব কিছুটা যেন শিথিল। কেন? তার পর?)

নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ঘরটিতে ঢুকেই ব্রহ্ম ঠিক করলেন, তথাকথিত শত্রুর সঙ্গে ঘর করতে গেলে তাঁদের যে সাবধানতাগুলো আগেই নিতে হবে, তা আশ্চর্যকে এইবেলা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। হয়তো সে জন্যই তাঁর মুখটা কঠিন দেখাল। তিনি গেস্টরুমে তাঁদের পৌঁছে দিতে আসা চার্টওয়েল্ সাহেবকে বললেন, "লেট্‌স প্রিটেন্ড মাই ফ্রেন্ড, আমি তোমার

চিকিৎসার জন্যই এখানে এসেছি। সে ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তোমার রোজ তো একটা বসার, কথা বলার সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ তুমি যদি বলো, খাওয়ার সময় কথা হবে, তা কিন্তু চলবে না। খাওয়ার সময় আমি কথা বলি না। তা ছাড়াও খাওয়া দাওয়া আমি একান্তেই করি। আমার অনুরোধ, আমাদের দু'জনের খাবার আমাদের ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বোলো। ঘরে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার রয়েছে। একটা সাইড টেবিলও রয়েছে। ফাইন! বেড়ে বন্দোবস্ত। খাওয়ার পাট এই ঘরেই আমাদের দিব্যি চলে যাবে!"

জন বললেন, "তাতে কোনও অসুবিধেই নেই। আমরা এখানে অনেক রাতে ডিনার করি না। সন্ধে সন্ধেয় সাপার সেরে নিই। আজকে আর আলাদা করে তোমার সঙ্গে বসব না। তার চেয়ে বরং তোমরা ফ্রেশ হয়ে নাও। তার পর বাগানটা এক বার তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাই। আমার পশুশালা কিন্তু দেখার মতোই একটা ব্যাপার। এ রকম ব্যাপার কারও বাড়িতে জীবনেও হয়তো তুমি দেখোনি!"

"উত্তম প্রস্তাব। পিছনের বাগানে কোনও খাঁচা চোখে পড়েনি। তবে কয়েকটা ছোট ছোট গোলাকার বাউন্ডারি ওয়াল দেখেছি। ওর মধ্যেই কি পশুরা আছে? আর পিছনের জঙ্গলটা? ওই জঙ্গলেও কি হিংস্র পশু আছে?"

"না, ব্ল্যাক লেপার্ড এক কালে থাকলেও কাছাকাছি জঙ্গলে আর নেই। বড় কোনও জানোয়ার আর নেই। আমাদের এবং আমাদেরই মতো আরও কিছু শিকারি বংশের সৌজন্যে এই জঙ্গলে আর ভয়ের কিছু নেই।"

জন ওদের ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে সাময়িক

বিদায় নিলে আশ্চর্য বলল, "ব্রহ্মদা, বাড়ির নামটা ফলকে লেখা দেখলাম, 'নিউম্যান'স এন্ড'! এ রকম নাম কেন? কিছু বুঝতে পারলেন?"

ব্রহ্ম ঠাকুর পাইপে একটা টান দিয়ে বেশ অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কিছু কেন হে? পুরোটাই বুঝেছি। ফলকটা পড়ে বেশ বোঝা গেল এই বাড়িটি রয়েছে গ্রামের একদম শেষ সীমানায়। তাই জন্যই 'এন্ড' শব্দটা। দেখতেই তো পেলে, পিছনের বাগানের অনতিদূরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে এপিং ফরেস্ট। এই এপিং হল বিশাল জঙ্গল এলাকা। এমনকি এই জঙ্গলের নামেই পরিচিত এই জেলাটি, এপিং ফরেস্ট ডিস্ট্রিক্ট। আর 'নিউম্যান' কে? আমার আন্দাজ এই বাড়ির আগের মালিকেরই নাম হল পল নিউম্যান, যাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটি কিনতে পেরেছে জন চার্টওয়েল। ভুলে গেলে, জন আমাদের প্রথমে কী পরিচয় দিয়েছিল? সে বলেছিল, তার নাম হল পল নিউম্যান। এই ফলকের নিউম্যানই হল সেই নিউম্যান। কী করে বুঝলাম? ফলকটি পুরনো লাগছে তো তোমার! কিন্তু ভেবে বলো তো, বাড়িটির মতো পুরনো কি? বাড়ির বয়স যদিও দুশো বছর, কিন্তু খুব বেশি হলে সত্তর বছর হবে ওই রকম ফলকের ডিজ়াইন বা খোদাই করার কায়দা। ফলে বোঝাই যাচ্ছে ওটা এই বাড়ির প্রাচীন মালিকানার সঙ্গে যুক্ত নয় মোটেই, ঠিক এর আগের মালিকেরই কীর্তি। আমার কী মনে হয় জানো? হয়তো এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই এখন পরিচিত হয়ে গেছে এই বাড়ির নামে। ইংল্যান্ডে এ রকম ব্যাপার প্রায়ই হয়। জনবিরল পাড়ায় এ রকম একটা পুরনো বাড়ির উপস্থিতি থাকলে বাড়িটার নামেই লোকে নিজেদের পাড়াকে পরিচিত করাতে থাকে। তাই জন্যই জন চার্টওয়েল বাড়িটার দখল নেওয়ার পরেও বাড়ির নাম অপরিবর্তিতই রেখে দিয়েছে।"

পিছনের খাঁচার সামনে গিয়ে দেখা গেল একটিতে একটি হিংস্র প্যান্থার যথেষ্ট চঞ্চলতার সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক পাশের সংলগ্ন খাঁচায় রয়েছে একটি ওরাংওটাং এবং দু'টি শিম্পাঞ্জি। ওরাংওটাংটি একটু ঝিম মেরে বসে আছে। শিম্পাঞ্জি লাফালাফি করছে খাঁচার ভিতরে রাখা একটি দোলনায়। এই খাঁচাটার মধ্যে দু'টি ছোট আকারের খুপরি খাঁচাও বসানো আছে।

আশ্চর্য বলল, "ব্রহ্মদা, আপনি যেটা বললেন, সে রকম ব্যাপার আমাদের শহরেও কিন্তু ঘটে! ট্রামে-বাসে চড়লেই কন্ডাক্টরদের মুখের ভাষায় এ রকম ইমপ্রম্পটু নাম অনেকই শোনা যায়। এই তো, আমার এক স্কুলের বন্ধু সমীর দে শখ করে তার বাড়ির নাম রেখেছিল 'জাহান্নম'। সেটা এত পপুলার হয়ে যায় যে, সেই থেকে গড়িয়ার একটা বাস স্টপের নামই হয়ে গেল জাহান্নম!"

ব্রহ্ম ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছিলেন। তার পর কী যেন ভেবে বিড়বিড় করে বললেন, "তার আগে অবশ্য কাজ মিটিয়ে ফিরতে হবে কলকাতায়। কাজটা যে কী, আপাতত তা বুঝতে পারাটাই যে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং!"

কিছু ক্ষণ পর ওরা তিন জন, মানে ড.ব্রহ্ম ঠাকুর, আশ্চর্য এবং জন চার্টওয়েল পিছনের বাগানের চিড়িয়াখানা দেখতে বেরোল। পিছনের বাগানে ঢুকলে দেখা যায়, সামনে ও পিছনে গোলাকার দুটো বিরাট গর্ত রয়েছে সমান সমান দূরত্বে। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠলে তবেই গর্ত দুটোর কিনারে যাওয়া যায়। প্রথম গর্তের কাছে পৌঁছে গিয়ে জন আর আশ্চর্য দেখল ব্রহ্ম ঠাকুর ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেন। আশ্চর্য চেঁচিয়ে বলল, "কী হল ব্রহ্মদা? আমরা দাঁড়াব?"

ব্রহ্ম বললেন, "একটা কাঁকর ঢুকে পড়েছিল জুতোয়, আসছি, আসছি। তোমরা এগোও।"

॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম ঠাকুর এসে পৌঁছোলে প্রথম গর্তের ধার থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল, গর্তের দেওয়ালটা এক্কেবারে খাড়াই। পাশে একটা সংকীর্ণ, এক জন নীচে নামার মতো লোহার সিঁড়ি আছে। গর্তের তলদেশে একটা ছোট জলাশয়, জলাশয়ের ধারে কিছুটা মাটি। মাটিতে শুয়ে রয়েছে একটি মাঝারি আকারের কুমির। জলে অর্ধেক ডুবে আর-একটি, সেটার আয়তন একটু বেশি। কুমিরগুলো বেশ নির্লিপ্ত। গর্তের উপরে আগত অতিথিদের তারা পাত্তাও দিচ্ছে না। জন আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ করলেন, "এই গর্তের মধ্যে যে পরিখাটা দেখছ, পরিখাটাই পিছনে ঘুরে দু'টি অনতিউচ্চ খাঁচা তৈরি করেছে। সামনে থেকে বোঝা যায় না। চলো, ওদিকটায় যাওয়া যাক।"

পিছনের খাঁচার সামনে গিয়ে দেখা গেল একটিতে একটি হিংস্র প্যান্থার যথেষ্ট চঞ্চলতার সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক পাশের সংলগ্ন খাঁচায় রয়েছে একটি ওরাং-ওটাং এবং দু'টি শিম্পাঞ্জি। ওরাং-ওটাংটি একটু ঝিম মেরে বসে আছে। শিম্পাঞ্জি লাফালাফি করছে খাঁচার ভিতরে রাখা একটি দোলনায়। এই খাঁচাটার মধ্যে দু'টি ছোট আকারের খুপরি খাঁচাও বসানো আছে। একটির মধ্যে রয়েছে একটি শজারু। অন্যটিতে রাখা একটা গাছের ডালে ঝুলছে তিনটে বড় আকারের বাদুড়।

ব্রহ্ম ঠাকুর জন চার্টওয়েলের শরীরে আগেই দেখা আঁচড়ের দাগগুলো মেলাতে চাইছিলেন পোষ্যগুলোর সঙ্গে। শজারু, ওরাংওটাং হতেই পারে। শিম্পাঞ্জিও আঁচড়ে দিতে পারে। কিন্তু কেন? পশুগুলো তাদের মালিককে হঠাৎ আঁচড়াতে যাবে কেন? রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়ই কেউ না-কেউ আছেন!

"এই যে, টমাস, এসে গেছ... আলাপ করিয়ে দিই, ইনি বিখ্যাত সাইকায়াট্রিস্ট ড. ব্রহ্ম ঠাকুর, ইনি তরুণ ফিল্মস্টার আশ্চর্য, আর ইনি আমার পশুশালার যাবতীয় খুঁটিনাটি থেকে বড়সড়, সব ব্যাপারেই আমার রক্ষাকর্তা— এঁকে ছাড়া সম্ভবই না। মি.জেমস টমাস।"

টমাস বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা গড়নের খাটো উচ্চতার লোক। হাতটা

বাড়িয়ে দিল সে, দু'জনের দিকেই। হাত মেলানোর জোরে ঝাঁকুনিটার পরেই আশ্চর্য টের পেল, 'নাহ। লোকটির কব্জিতে বেশ জোর আছে!'

"থমাস, এঁদের তো সবই দেখালাম, আসল অ্যাট্রাকশনটাই কিন্তু বাকি রয়ে গেল। দেখিয়ে ফেলি এ বার, না কি?"

বিগলিত এবং দেঁতো হাসি হেসে টমাস বলল, "অ্যাবসোলিউটলি মাস্টার!"

"মহামান্য অতিথিগণ, এ বার দেখবেন এই গরিবের সংগ্রহশালার শ্রেষ্ঠ রত্নটি— আপনারা যে অঞ্চলের লোক, এই জীবটির আদি বাসস্থানও কিন্তু সেইটিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্য কিছুই নয়, এটি হল চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একটি রাজকীয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এর ডাকনামটাও তাই জন্যই 'রয়্যাল'। অবশ্য ওই নামটা সংক্ষিপ্ত হয়ে এখন আমরা 'রয়' বলেই ওটিকে ডাকি।"

এই বলে জন এক ছুটে পিছনের গর্তের পরিখাটার ধারে উঠে গেল। তার পর নীচে মুখ বাড়িয়ে শিস দিল। জোরালো গলায় সুর করে ডাকতে থাকল, "র-য়... র-য়..."

পাইপ মুখে কামড়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুরো ব্যাপারটাই মাথার মধ্যে ছকে নিচ্ছিলেন ব্রহ্ম ঠাকুর। এ বার পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে তিনি জনের গলাটা আর রয় বলে ডাকার কায়দাটা দু'বার অনুচ্চ গলায় অভ্যেস করে নিলেন। তার পর দু'ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন জনের পাশে। তত ক্ষণে আশ্চর্যও উঠে এসেছে সেখানে।

নীচের গর্তের দেওয়াল এখানেও সম্পূর্ণ খাড়া। নামার জন্য লোহার সিঁড়ি একটা আছে। সেটা সুইচ টিপলে নেমে যায় এবং উঠে আসে। গর্তটার মেঝেতে বাঁ দিকে রয়েছে একটা খাঁচার শিক। শিকগুলো আপাতত উপরে তোলা, মানে খাঁচাটা আপাতত খোলা। গর্তের উল্টো দিকের দেওয়ালটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার দেড়শো মিটারের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে জঙ্গল। প্রথমে অল্প, তার পর বেশ ঘন।

জন চার্টওয়েলের ডাকটা শুনে লাফ দিয়ে খাঁচাটার বাইরে বেরিয়ে এল রয় নামের বাঘটি। তার পর চক্রাকারে ঘুরতে থাকল জায়গাটা জুড়ে। দু'-এক বার শোনা গেল তার মৃদু গর্জন। মনে হল, অনেক দিন পর মনিবের ডাক শুনে রয় বেশ খুশিই হয়েছে।

বাঘের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর ওরা তিন জন ড্রয়িং রুমে ফিরে এসেছিল। বাঘ পোষা বিষয়ে হালকা আড্ডা হল। ব্রহ্ম ঠাকুর জন চার্টওয়েলকে শোনালেন সিমলিপালের পোষা বাঘ 'খৈরি'-র গল্প। তার পর হঠাৎ করেই প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা জন, এই বাড়ির পুরনো মালিক কি এক জন বিজ্ঞানী ছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাই শুনেছিলাম বটে। কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"নাহ এমনিই! আচ্ছা, সেই বিজ্ঞানী মারা যান কী ভাবে? তিনি না মারা গেলে তো তুমি এই বাড়িটা ফিরে পেতে না..."

"দুঃখিত ডক্টর, সেটা স্পষ্ট ভাবে আমার জানা নেই।"

ব্রহ্ম ঠাকুর চুপ করে জনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছু ক্ষণ। তার পর 'শুভরাত্রি' বলে আচমকাই উঠে পড়লেন। হাঁটা লাগালেন নিজের ঘরের দিকে। জন প্রথমটায় একটু থতমত খেলেন। তার পর পিছন থেকে একটা হাঁক দিয়ে জানিয়ে দিলেন, একটু পরেই ওদের ঘরে সাপার পৌঁছে যাবে।

ব্রহ্মের পিছু পিছু আশ্চর্যও ঘরে চলে এসেছিল। সে ঢুকলে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ব্রহ্ম ঠাকুর তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট ব্লু টুথ স্পিকার বের করে আনলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মোবাইল ফোনে গান চালানোর বন্দোবস্ত আছে আশ্চর্য? আমার মোবাইলে সে সব ব্যবস্থা রাখিনি, এ দিকে এক্ষুনি ভীষণ গান শুনতে ইচ্ছে করছে যে! এক্ষুনি গান চালাতেই হবে আমায়! কী করি... কী করি..."

ব্রহ্ম ঠাকুর বেসামালভাবে ছটফট করছেন দেখে আশ্চর্য তাড়াতাড়ি তার ফোনের গান শোনার অ্যাপটা খুলে ব্রহ্মের হাতে দিল। ব্রহ্ম ঘেঁটেঘুঁটে একটা অ্যালবাম খুঁজে বের করে স্পিকারটার সঙ্গে জুড়ে সেটা চালিয়ে দিলেন। জিনিসটা ছোট হলেও বেশ জোরে বাজে। পুরো ঘরটা গমগম করে উঠল মিউজ়িকে।

ব্রহ্ম এ বার বাদ্যযন্ত্রের কলরোল ছাপিয়ে উঁচু গলায় বললেন, "শোনো হে আশ্চর্য, এই অ্যালবামটা নিশ্চয়ই তুমি শোনোনি। এটা হল পিঙ্ক ফ্লয়েড পরবর্তী জীবনে সিড ব্যারেটের প্রথম সোলো অ্যালবাম 'দ্য ম্যাডক্যাপ লাফস'। এটা আমার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কিছু সূত্র দিয়েছে। বিশেষ করে দুই নম্বর আর চার নম্বর গান দুটো। দুই আর চার কেন বলো তো? সেই যে তোমায় বলেছিলাম চ্যাপ্টার চব্বিশ গানটার কথা, আশা করি মনে আছে। দুই আর চার পাশাপাশি বসেই তো চব্বিশ হয়, তাই না?"

তার পর ব্রহ্ম গলা নামিয়ে আশ্চর্যর শোনার মতো করে বললেন, "আমরা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বললে আশা করি লুকোনো মাইকে রেকর্ড করেও সুবিধে হবে না বাছাধনদের। তবুও সাবধানের মার নেই। তাই জন্যেই দরকারি কথোপকথনের সময় ঘরে জোরে গান বাজবে।"

এ বার তাঁর সুটকেস থেকে চারটে মাঝারি সাইজ়ের বোতল বের করে টেবিলে রাখলেন ড. ব্রহ্ম ঠাকুর। তার পর বের করলেন বেশ কিছু ঢাকনা লাগানো টেস্টটিউব গোছের জিনিস।

সেগুলো টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে আশ্চর্যকে বললেন, "থাইল্যান্ডের কাঞ্চনবুরিতে বাঘের সঙ্গে বসবাস করেন বৌদ্ধ সাধুরা। আমি এক বার কৌতূহল নিবৃত্ত করতেই তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম বেশ কিছু দিন। কথিত আছে, বাঘেদের নাকি আফিম খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হয় সেখানে। আমি অবশ্য তখন তেমন কিছু দেখিনি। বরং কিছু শিকড়বাকড় ব্যবহার করতে দেখেছিলাম সাধুদেরই। আর বাঘের বিহেভিয়ারও কিছুটা স্টাডি করতে পেরেছিলাম। রয় নামের বাঘটারও রকমসকম খানিকটা তাই বুঝেছি। এই বাঘ রীতিমতো ট্রেন্ড। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ একে দিয়ে খানিকটা করিয়ে নিতে পারে জন। আর ওই ষণ্ডাগোছের শাগরেদ জেমস টমাসের মনে যে কী আছে, তা সে-ই জানে! কাজেই আমাদের কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই বাড়িতে। আচ্ছা আশ্চর্য, এই বাড়ির নীচ তলাটা কেমন দেখলে?"

আশ্চর্য বলল, "কই ব্রহ্মদা, নীচতলা তো পুরোটাই অন্ধকার। কিছুই তো..."

(ক্রমশ)

ছবি: রৌদ্র মিত্র
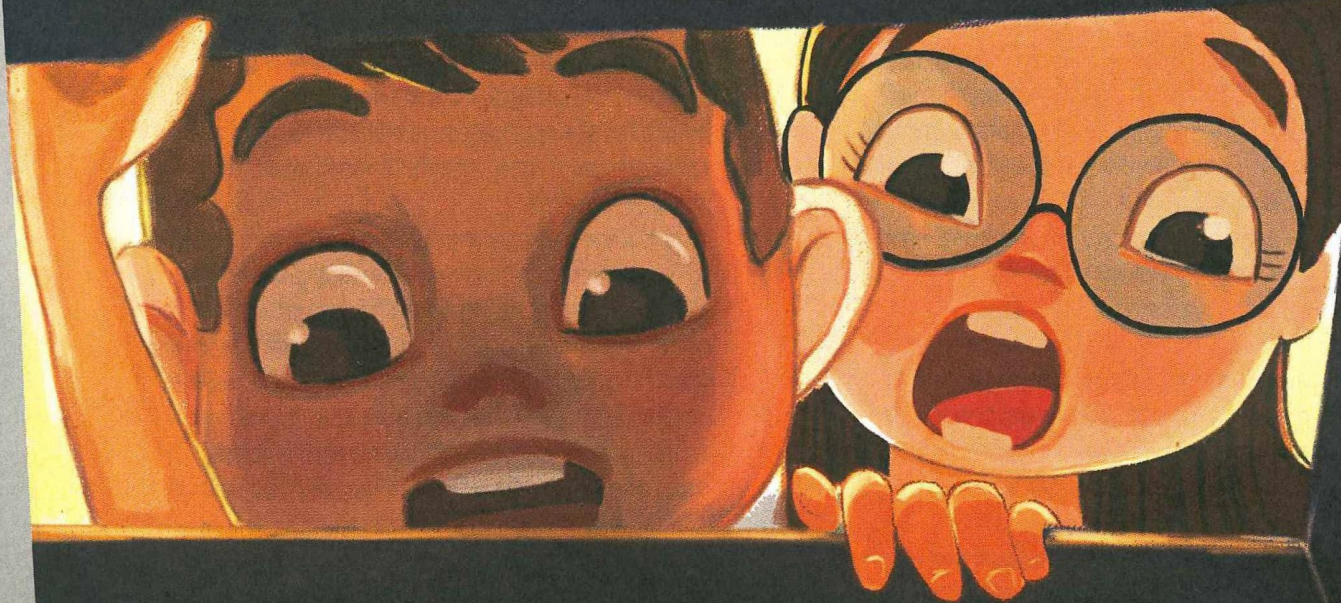
কুল-লকেট

অদিতি ভট্টাচার্য

আজ ছুটির দিন, কিন্তু সকাল থেকেই হুলস্থুল পড়ে গেছে। কী না, মণিদিদার কুল-লকেট পাওয়া যাচ্ছে না। কুল-লকেট কী, তা আমি জানি না, বাবা-মাও জানেন বলে মনে হল না, তবে খবরটা শুনেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োলেন, সঙ্গে আমিও। গিয়ে দেখি টিটোও আছে ওখানে। আমাদের পাড়ার এই এক ব্যাপার, কারও কিছু হলে সবাই জানতে

পারে। সবাই এক সঙ্গে মিলে সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

মণিদিদা আমাদের পাড়ার শুভঙ্করজেঠুর কাকিমা। শুভঙ্করজেঠুদের কাছেই থাকেন, অতি চমৎকার মানুষ। ও পার বাংলার মেয়ে, এই বাঙাল ভাষায় কথা বলছেন তো এই আমাদের মতো করে বলছেন, আবার কিছু দিন ধরে খুব ইংরেজি শেখার শখ হয়েছে বলে তাও একটু-আধটু শিখছেন। এ কাজটা আমরাই করি, যে যেমন পারি মণিদিদাকে ইংরেজি শেখাই। বাচ্চাদের উনি আদর করে মণি বলেন বলে ওঁর নামই হয়ে গেছে মণিদিদা। কে যে নামটা চালু করেছিল তা অবশ্য জানি না। মোট কথা মণিদিদা আমাদের খুব পছন্দের মানুষ। তাঁর কুল-লকেট হারিয়ে গেছে, এ কী যে-সে কথা?

মণিদিদাদের বাড়ির পরিস্থিতি সত্যিই থমথমে। মণিদিদা থেকে থেকে আঁচলে চোখের জল মুছছেন আর বলছেন, "তোমরা কষ্ট পেয়ো না গোপাল, ও আমার কপালে নেই। ব্যাড লাক, না হলে বাড়ি থেকে জিনিস হারিয়ে যায়!"

মণিদিদা শুভঙ্করজেঠুকে গোপাল বলে ডাকেন, ছোটবেলা থেকেই নাকি। ও দিকে ভিতরের ঘরে বনিদিদি বিছানায় শুয়ে। নতুন চাকরি পেয়ে বনিদিদি মণিদিদার জন্যে কুল-লকেট কিনে এনেছিল, "এই দ্যাখো, ঠাম্মা তোমার জন্যে কেমন সুন্দর ফুল-লকেট এনেছি।"

মণিদিদা ফুলকে কুল শুনলেন, বললেন,"কুল-লকেট? হেইডা কীডা মণি? কুলে তো আচার হয়, অম্বলও হয়, মা সরস্বতীর প্রসাদে দেয়, লকেট হয় ক্যামনে?"

"কুল নয় গো, ফুল ফুল," বনিদিদি বলেছে, "এই দ্যাখো, লকেটটা ফুলের মতো দেখতে, তাই বললাম ফুল-লকেট।"

মণিদিদা লকেট দেখে খুব খুশি। সব কিছু শুভঙ্করজেঠুকে না দেখালে ওঁর চলে না, তাই ডাকলেন, "অ গোপাল, তুমি গেলে কই? আমার কুল-লকেট দেইখ্যা যাও।"

"আবার কুল-লকেট বলছ ঠাম্মা? শুধু লকেটই বলো না," বনিদিদি বলেছে।

মণিদিদা হেসে বলেছেন, "বোঝলা না? মুখ দিয়া এক বার যেইডা বার হইছে হেইডাই মস্তকে রইয়া যায়। নড়ন-চড়ন হয় না।"

শুভঙ্করজেঠু এসেছেন, মণিদিদা তাঁর হাতে লকেট দিয়েছেন, শুভঙ্করজেঠু বলেছেন, "সুন্দর লকেট!"

মণিদিদা তখনই জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির কাকিমাকে কুল-লকেটের কথা বলেছেন, তার পর বনিদিদিকে বলেছেন, "অ মণি এক বার ছুটনেরে ফোনডা দিবা? তারেও কইয়া রাহি, আইস্যা দেইখ্যা যাক।"

বনিদিদি ফোন দিয়ে চলে গেল, মণিদিদা তাঁর বোনকে কুল-লকেটের কথা তো বটেই, আরও অনেক কথাটথা বলে আবার বনিদিদিকে ডাকলেন, "এই বার লকেটটা লাগাইয়া দাও। বিউটিফুল লকেট, দিদি।"

এই বারই হল আসল গোলমাল। দেখা গেল লকেট নেই। মণিদিদা বললেন, "আমি যে গোপালেরে দিলাম, সে গেল কই?"

বনিদিদি যত বলে, "বাবাকে দেখতে দিয়েছিলে সে তো জানি, কিন্তু বাবা কি আর তোমাকে দেয়নি?"

মণিদিদা তত বলেন, "হেইডা স্মরণে নাই।"

তখন মণিদিদা বিছানায় বসেছিলেন, সেখানে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। খাটের তলাও দেখা হল, কোথাও কুল-লকেট নেই। শুভঙ্করজেঠু গেছিলেন এক প্রতিবেশীর বাড়িতে, ফিরে এসে সব শুনে তিনিও মাথায় হাত গিয়ে বসে পড়লেন আর বনিদিদি ঘরে গিয়ে শয্যা নিল। এ সব কথা আমরা বাবুনদাদার মুখে শুনলাম। এই নিয়ে নাকি সাড়ে তেরো বার বাবুনদাদাকে সব বলতে হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সাড়ে তেরো বার কেন? অর্ধেকটা কাকে বললে আবার?"

বাবুনদাদা বলল, "এই সবের মধ্যেই তো অর্চনামাসি এল। পুরোটা বলতে হয়নি, শুধু বাবার লকেট দেখা অবধি বললাম। তাই সাড়ে তেরো বার। অর্চনামাসিই তো খাটের নীচে ঢুকে গিয়ে দেখল, তাও পেল না।"

এখন মণিদিদা তো আর বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যাননি, তাই কুল-লকেট ওঁর কাছে থাকলে বাড়িতে থাকবে। বাবুনদাদা মহা উৎসাহে বাড়ির সব জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করল। টিটো আর আমিও জুটে গেলাম। এ সব কাজে সাহায্য না করলে হয় কখনও? বাড়িতে কম জিনিসপত্র? পাশের বাড়ির পুঁচকে তুলতুলও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাল।

ও দিকে জেঠিমা শুভঙ্করজেঠুকে খালি একই কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, "কাকিমা তোমার হাতে লকেটটা দিয়েছিলেন..."

"সে তো দিয়েছিলেন," শুভঙ্করজেঠু জেঠিমাকে বললেন, "আমি দেখলাম, কিন্তু তার পরে যে কী হল..."

"তার পরে যে কী হল মানে? তুমি কি লকেটটা আবার কাকিমাকে দিয়েছিলে? কাকিমার তো মনে নেই বলছেন।"

"সেইটাই তো কথা, আমারও কিচ্ছু মনে পড়ছে না। যেন এর পর থেকে মেমরি পুরো ওয়াইপড আউট," বললেন শুভঙ্করজেঠু।

"ওয়াইপড আউট না হাতি! জিনিসটা হারিয়ে এখন এই সব বকছ! কাকিমার

মনে নেই কারণ তুমি লকেটটা কাকিমার হাতে আর দাওইনি। কাকিমা, আপনার গোপালই কিন্তু এই কাণ্ডটা করল," জেঠিমা খুব রেগে গেছেন।

"ও বৌমা, যে জিনিস থাকার নয় তা চলে যাবেই। আমি বুড়ি মানুষ, আমার স্মরণে নাই সে হইতে পারে, কিন্তু আমার গোপাল, সে অমন হাট্টাকাট্টা জোয়ান মানুষ, তারও স্মরণে নাই! ভেরি ব্যাড লাক মা, না হলে এমন হয় কখনও!

ভগবানের যা ইচ্ছে!” মণিদিদার গলা ধরে এল।

“আপনি তো বলছেন, ও দিকে আপনার নাতনি লকেটের শোকে বিছানা নিয়েছে,” জেঠিমা বললেন।

“আমি দেখতাসি... মণি, অ মণি...” মণিদিদা বনিদিদির ঘরের দিকে রওনা হলেন।

“এ ভাবে হাতে হাত ধরে বসে থাকার তো কোনও মানে হয় না, কিছু তো একটা করতে হয়,” বাবা বললেন, “আচ্ছা শুভঙ্করদা, আপনি কোথায় গেছিলেন বলুন তো? কার বাড়িতে?”

“অবিনাশদার বাড়িতে। অবিনাশদা এসে ডাকলেন। উনি সোফা সেট করাবেন বলেছিলেন, আমার চেনা কাঠের মিস্ত্রির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সোফা সেট আজ দিয়েছে, তাই উনি আমাকে ডাকতে এলেন, বললেন, ‘এক বার এসে দেখে যাও তো,’ আমিও গেলাম। ওখান থেকে বাড়ি ফিরেই শুনি এই কাণ্ড,” বললেন শুভঙ্করজেঠু।

“এই কথাটা আগে বলবেন তো,” বাবা একেবারে যেন লাফিয়ে উঠলেন।

আমরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এ দিকে এসেও দেখেশুনে যাচ্ছি সব। বাবা বললেন, “এক্ষুনি এক বার চলুন তো অবিনাশদার বাড়িতে, হতে পারে কুল-লকেট হাতে নিয়েই আপনি ওঁর বাড়িতে চলে গেছিলেন। মনে আছে এক বার, এক দিন সকাল সকাল খবরের কাগজটা তুলে সেটা হাতে নিয়েই আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন? চলুন চলুন।”

“ঠিক বলেছো তুমি, চলো তো,” শুভঙ্করজেঠুও উঠে পড়লেন।

বাড়ি থেকে বেরোতেই অবিনাশজেঠুর সঙ্গে দেখা, বললেন, “আমি বাজারে গেছিলাম, ফিরে এসেই এই ব্যাপার শুনে হন্তদন্ত হয়ে এলাম। কাকিমা এখন কেমন আছেন? খুব ভেঙে পড়েছেন নাকি?”

অবিনাশজেঠুকে সব বলা হল, উনিও “চলুন, চলুন” করলেন।

এর মধ্যে জেঠিমা ডাইনিং স্পেসে ঢুকে চিলচিৎকার করে উঠলেন, “হে ভগবান! একটু ও দিকে ছিলাম আর এর মধ্যে এরা এই কাণ্ড করেছে! আলমারি থেকে সমস্ত বাসনকোসন নামিয়ে ফেলেছে! কাচের বাসনগুলোও বাদ দেয়নি! ও মা! নতুন কাচের গ্লাসটায় তো চিড় খেয়েছে! কত পছন্দ করে ছ'টার সেট কিনলাম। এ কী সর্বনাশ হল!”

টিটো আর আমি বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়, এখন এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল। আমরাও তাই অবিনাশজেঠুর বাড়ির দিকে চললাম। যেতে যেতে শুনতে পেলাম জেঠিমা

ও দিকে বাবা আর শুভঙ্করজেঠু মিলে রাস্তাতেও খানিক খোঁজাখুঁজি করলেন। অবিনাশজেঠুর বাড়ির ঠিক তিনটে বাড়ি পরে, একই লাইনে। “আমি আর অবিনাশদা তো রাস্তা দিয়েও যাইনি। দু'জনে কথা বলতে বলতে এই ঘাসের উপর দিয়েই তো গেলাম,” বললেন শুভঙ্করজেঠু।

বাবুনদাদাকে খুব বকছেন।

অবিনাশজেঠুর বাড়িতে সোফা, সোফার আশপাশে সব আঁতিপাতি করে খোঁজা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না।

“শুভঙ্কর, তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে যেন মনে হচ্ছে,” অবিনাশজেঠু বললেন, “কী দেখছিলে বলো তো?”

“দেখছিলাম, কী দেখছিলাম?” শুভঙ্করজেঠু কী রকম যেন ফ্যালফ্যাল করে বললেন। ওঁর স্মৃতি থেকে সত্যিই সব কিছু মুছে গেল নাকি?

“হঠাৎ কোনও বাজে ঘটনা ঘটলে হয় এ রকম, আমি জানি। সবাই সহ্য করতে পারে না। অনেক সময় নিজের নামটামও নাকি মনে থাকে না,” টিটো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বেশ বিজ্ঞ বিজ্ঞ গলায় বলল।

“মনে পড়েছে,” অবিনাশজেঠুই আবার বললেন, “সেন্টার টেবিলের উপর পত্রিকাটা ছিল, সেটাই দেখছিলে। কিন্তু সেটা গেল কোথায়? এই তো ছিল?”

“ওটা তো এই কিছু ক্ষণ আগে প্রীতম এসে নিয়ে গেল, তুমি নাকি ওকে দেবে বলেছিলে,” রমাজেঠিমা বললেন।

“তা হলে তো এক বার প্রীতমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। যদি কোনও ভাবে জিনিসটা বইয়ের মধ্যে ঢুকে থাকে। দেখি আগে ফোন করে, তার পরে না হয় বাড়িতেই যাব,” অবিনাশজেঠু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ও দিকে বাবা আর শুভঙ্করজেঠু মিলে রাস্তাতেও খানিক খোঁজাখুঁজি করলেন। অবিনাশজেঠুর বাড়ির ঠিক তিনটে বাড়ি পরে, একই লাইনে।

“আমি আর অবিনাশদা তো রাস্তা দিয়েও যাইনি। দু'জনে কথা বলতে বলতে এই ঘাসের উপর দিয়েই তো গেলাম,” বললেন শুভঙ্করজেঠু।

এই লাইনে প্রতিটা বাড়ি আর রাস্তার মাঝে খানিকটা জায়গা আছে, সবুজ ঘাসে ভরে থাকে জায়গাটা। বুঝলাম শুভঙ্করজেঠু এই জায়গাটার কথাই বলছেন।

“তা হলে তো আপনাদের বাড়ি থেকে অবিনাশদার বাড়ি— এই পুরো জায়গাটা ভাল করে দেখতে হয়,” বাবা বললেন।

এ দিকে অবিনাশজেঠুর ঠিক আগের বাড়ির মালি সামনের জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেছে, পাতাটাতা যা পড়েছিল সব রাস্তার ও পারে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

“সর্বনাশ! ওর মধ্যে নেই তো,” বাবা ছুটলেন সে দিকে, “এই শিগগির আগুন নেভাও, এক্ষুনি।”

“জল, জল...” বলে শুভঙ্করজেঠু ছুটলেন বাড়ির দিকে। আমরাও তাঁর পিছন পিছন। উনি এক বালতি ভর্তি জল আনলেন আর আমরা দু'জন দুটো মাঝারি আকারের ডেকচি ভর্তি করে নিয়ে এলাম। এ দিকে মালি এ সবের কিছুই জানে না, সে হাঁ করে আমাদের কাণ্ড দেখছে।

“চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কী? শিগগির জল আনো,” শুভঙ্করজেঠু তাকে বললেন। সে-ও আর না দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি দৌড়ল। কিছু ক্ষণ পরে আগুন নিভল, একটা লম্বা লাঠি এনে সেই আধ-জ্বলা পাতার স্তূপ অনেক ক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে দেখা হল।

“সোনার জিনিস, এক্ষুনি কি আর পুরো গলে যাবে? কিছু তো অন্তত

থাকবে,” শুভঙ্করজেঠু বললেন বটে, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। ও দিকে প্রীতমও জানিয়েছে যে, বইয়ের ভিতরে কিছু ছিল না।

“তা হলে এক কাজ করা যাক। মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করার ব্যবস্থা করা হোক, যদি রাস্তায় কেউ কুড়িয়ে পায়, তা হলে পাওয়া যাবে,” পাড়ারই এক কাকু বুদ্ধি দিলেন, “সব লোকই কি আর অসৎ হয়ে গেছে? মোটেই নয়, তা হলে আর দুনিয়া চলত না।”

অংশুদা ভাল আবৃত্তি করে, অনেক প্রাইজ়-টাইজ় পায়। তাকে ফোন করা হল। সে একটা টোটোয় চড়ে মাইকে লকেট হারানোর কথা বলতে বলতে যাবে। যা বলা হবে, তার বয়ানটা বাবুনদাদা তাড়াতাড়ি লিখে দিল। কুল-লকেট লিখেছিল বাবুন দাদা, জেঠিমা বললেন, “কুল-লকেট বললে কেউ কিছু বুঝবে? লেখ ফুল আকৃতির গোলাকার লকেট।”

টোটোও ঠিক হয়ে গেল, অংশুদা ফোন করে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছে।

সব করা হল, তার পর পুরো একটা দিনও কেটে গেল, কিন্তু লকেটের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক ভাবেই সকলের মন খুব খারাপ। হঠাৎ মণিদিদা বললেন, “যে বার আমার বড় মাসিমার বিছে হারটা হারিয়েছিল, আমার দিদিমা কী কইছিলেন জানো?”

এ কথা কারও জানার কথা নয়, তাই জেঠিমা জিজ্ঞেস করলেন, “কী বলেছিলেন?”

“দিদিমা বড় মাসিমারে কইলেন, ‘তুই কি কারেও কিছু দিস নাই? কেউ কি কিছু চাইছিল তর কাছে?’

“বড় মাসিমা মনে কইর‍্যা-কইর‍্যা কইলেন, ‘আমি দাওয়ায় বইস্যা খাইতাছিলাম, তোমাগো ভুলু কুকুর আইছিল, প্যাটে মনে হয় ক্ষুধা ছিল, খাইতে চাইছিল। দিই নাই। সেই জন্যই কি?’

“বড় মাসিমা তখনই ছটফট কইর‍্যা গিয়া ভুলুরে খাবার দিয়া আসলেন। ও মা, তার কিছু ক্ষণ পরেই বিছে হার পাওয়া গেল। ভাঁড়ার ঘরের কোণে বড় জালাটার পিছনে পড়ে ছিল। আমিও তাই মনে করত্যাসি...”

“এ আবার হয় নাকি? নেহাত কাকতলীয় ব্যাপার,” জেঠিমা মোটে পাত্তা দিতে চাইলেন না।

“হয় হয়। অ বৌমা, এত ক্ষণে স্মরণে আইসে। ওই বুড়াডা আইছিল। ভিক্ষা চাইছিল। আমি দিই নাই। তারে অহন কুথায় পাই?”

“ওকে আমি কৃষ্ণদার দোকানে চা-বিস্কুট খেতে দেখেছি। বোধ হয় রোজই যায়,” বাবুনদাদা বলল।

“রোজই যায়? তাইলে অহনই যাওন লাগে,” মণিদিদা উঠে পড়েছেন, “ও দাদা এক খান টোটোরে ডাকো দেখি।”

সবে পাঁচটা বাজে। কৃষ্ণদার চায়ের দোকান তখনও খোলেনি। মণিদিদা আর বাবুনদাদা টোটোয় বসে অপেক্ষা করছে। অবশেষে কৃষ্ণদা আসতেই তাকে ধরা হল। ওই বুড়ো লোকটিকে যে কেউ খুঁজতে পারে, তা-ই কৃষ্ণদার কল্পনার বাইরে। সে প্রথমে খুব অবাক হল, তার পরে বলল, “ওর কথা আর বলবেন না। মাথায় ছিট আছে। শুদুমুদু ভিক্ষে করে বেড়ায়। কোনও দরকার নেই। কাল ওর ছেলে এসে জোর করে নিয়ে গেল এখান থেকে। এক রকম রোগ বলতে পারেন। তবে কোথায় থাকে তা জানি না।”

মণিদিদারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।

“তবে এই যে সবাই আমারে এত ভালবাসে কুল-লকেট না হারাইলে বুঝতাম না। এইতেই আমার জীবনডা ধন্য হইয়া গ্যাসে। বুড়া বয়সে কয়জন পায় এমন ভালবাসা?” মণিদিদার চোখ ছলছল করে এল।

আরও এক দিন কেটে গেল। সকলের স্থির বিশ্বাস, ওটা হাতে নিয়েই শুভঙ্করজেঠু বেরিয়ে গেছিলেন, তার পর সেটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকবে। শুভঙ্করজেঠুও মরমে মরে আছেন যেন। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে চুপ করে বসে আছেন, এমন সময় তুলতুল এল। সে অনেক সময়েই এ বাড়িতে থাকে, বলল, “আমাদের সিক্রেটটা কিন্তু আমি কাউকে বলিনি।”

“সিক্রেট!” শুভঙ্করজেঠু কিছুই বুঝলেন না।

“ভুলে গেলে? তুমি আমাকে একটা জিনিস দিয়েছিলে না, বললে ঠিক করে রাখতে, সিক্রেট জিনিস?”

শুভঙ্করজেঠু আরওই কিছু বুঝলেন না, বললেন, “আমি আবার তোকে কী দিলাম? কখনই বা?”

“তুমি সব ভুলে যাও! এই দেখো,” তুলতুল এক বার আশপাশটা দেখে নিয়ে ওর মিকি মাউস আঁকা ছোট্ট ব্যাগটার মধ্যে থেকে সন্তর্পণে একটা জিনিস বের করে শুভঙ্করজেঠুকে দিল।

শুভঙ্করজেঠু কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে রইলেন, তার পর লাফিয়ে উঠলেন, “পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!”

সবাই দৌড়ে এল। কিন্তু কুল-লকেট তুলতুলের কাছে গেল কী করে? শুভঙ্করজেঠু তো কিছুই বলতে পারছেন না, সকলে তুলতুলকেই নিয়ে পড়ল। মোটে পাঁচ বছরের হলে কী হয়, তুলতুল কিন্তু সব বলল। সে দিন শুভঙ্করজেঠু অবিনাশজেঠুর বাড়ি যাওয়ার আগে, না-দেখেই হাত বাড়িয়ে বলেছেন, “নে ধর, ঠিক করে রেখে দে।”

“সে তো বনিকে, ও তো আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল,” বললেন শুভঙ্করজেঠু।

“বনিদিদিকে তো দাওনি, বনিদিদি তো ছিলই না, আমাকে দিলে,” বলল তুলতুল, “আমি বললাম, ‘এটা তোমার আর আমার সিক্রেট জিনিস? ব্যাগে রেখে দিই? তুমি ‘হ্যাঁ’ বললে জেঠু।”

আসলে তখন অবিনাশজেঠু এসে বলেছেন, “তুমি এক বার ভাল করে দেখেশুনে নাও তো। আসছ তো?”

শুভঙ্করজেঠু তুলতুলের কথা খেয়ালই করেননি, অবিনাশজেঠুকে “হ্যাঁ-হ্যাঁ” বলে ওঁর সঙ্গে চলে গেছেন। তুলতুল এ রকম একটা দায়িত্ব পেয়ে যারপরনাই গর্বিত হয়ে লকেটটাকে ব্যাগে রেখে দিল। ওটাই যে মণিদিদার কুল-লকেট, সে তো আর ও বোঝেনি।

“আশ্চর্য লোক তুমি!” জেঠিমা বললেন, “লকেটটা বনিকে দিচ্ছ না তুলতুলকে দিচ্ছ বুঝতে পারলে না! আবার দিয়ে ভুলেও গেলে! ভাগ্যিস ও যত্ন করে ব্যাগে রেখে দিয়েছিল।”

“কুউল!” মণিদিদা বলে উঠলেন।

সবাই চমকে উঠে মণিদিদার দিকে তাকাল।

“তোমরা কও না? আমিও কইলাম। কুলে-কুলে এক্কেরে এক হইয়া গেল,” এক গাল হেসে মণিদিদা বললেন।

ছবি: বৈশালী সরকার

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।
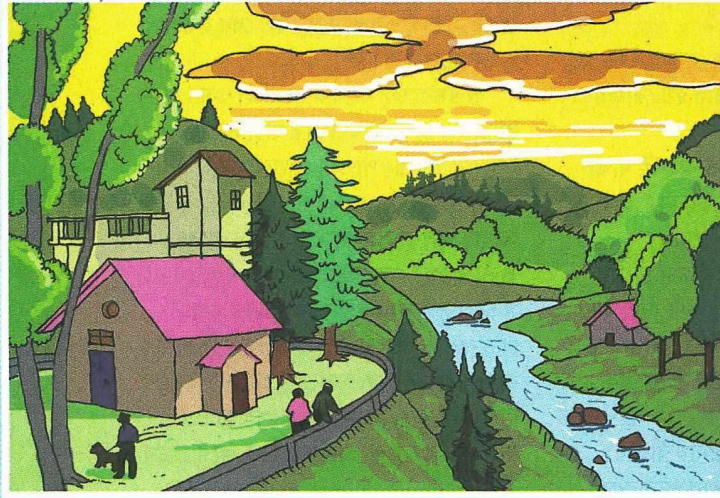
ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ
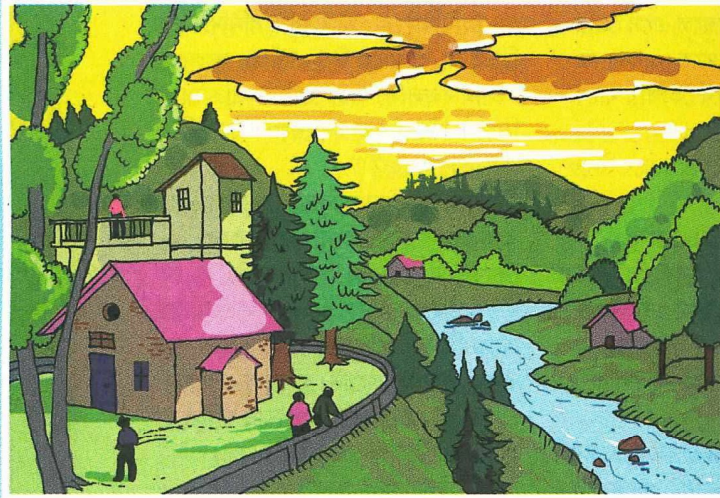
উত্তর: ২০ সেপ্টেম্বর

গত সংখ্যার উত্তর

১। দূরে লাইট হাউস থেকে আলো বেরোচ্ছে।
২। ছেলে প্যারাশুটারটির বেল্ট দেখা গেছে।
৩। ক্রুজ় জাহাজটি ছোট হয়েছে আকারে।
৪। মেয়েটির জামায় 'M' অক্ষরটি 'A' হয়েছে।
৫। মেয়েটি দুটো হাতে গ্লাভস পরেছে।
৬। একটা বাড়ি কমে গেছে।
৭। দূরে পাহাড়ের কোলে দুটো বাড়ি গজিয়েছে।
৮। ডান দিকে কোণে বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে না।

সুদোকু

২							৭	
		৪	৭	৫		৩		৮
	১		৪		৩			
			৯			৪		৩
৩				৭				৯
৫		৯			৮			
			১		৪		৫	
৬		৩		৯	৭	৮		
	৯							২

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

২	৩	১	৯	৮	৬	৫	৭	৪
৫	৪	৬	৭	১	২	৯	৮	৩
৭	৯	৮	৫	৪	৩	২	৬	১
৬	২	৪	৮	৩	১	৭	৯	৫
১	৭	৯	২	৬	৫	৪	৩	৮
৮	৫	৩	৪	৯	৭	৬	১	২
৪	১	৭	৬	২	৮	৩	৫	৯
৩	৬	২	১	৫	৯	৮	৪	৭
৯	৮	৫	৩	৭	৪	১	২	৬

১		২	■	৩	৪	৫	৬
	■	৭	৮	■	৯		
১০	১১	■	১২			■	
১৩		■		■	১৪	১৫	■
■	১৬	১৭	■	১৮	■	১৯	২০
২১	■	২২			■	২৩	
২৪	২৫		■	২৬	২৭	■	
২৮				■	২৯		

পাশাপাশি

১। গ্রীষ্ম।
৩। অস্থির।
৭। গরম কালের একটি ফল।
৯। এই গুড় খুবই উপাদেয়।
১০। কণ্ঠ।
১২। হারের মাঝখানে থাকে।
১৩। আগে গ যোগ করলেই বিষ।
১৪। অজয়, রূপনারায়ণ ইত্যাদি যা।
১৬। নতুন।
১৯। ধুলো।
২২। জাঁক।
২৩। মায়ের ভাই।
২৪। উৎসব।
২৬। কানের নীচের নরম অংশ।
২৮। ভয়ে এরকম হয়ে থাকে।
২৯। সূর্য।

উপর-নীচ

১। রাগে কুকুর এমন করে।
২। স্ফূর্তি।
৪। হাতে-পায়ে ব্যথা হলে এমনটা করে থাকে।
৫। কারণে।
৬। হুঁশ।
৮। ক্ষত নিরাময়ের ওষুধ।
১১। কুষ্ঠিয়ার সাধক-গায়ক।
১৫। কুঁড়েঘর তৈরি হয় যা দিয়ে।
১৭। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি শহর।
১৮। সব।
২০। যে সমাজবন্ধু আবর্জনা পরিষ্কার করেন।
২১। অন্য।
২৫। চামড়ার নীচে যা বইছে।
২৭। বৃহত্তম প্রাণী।

গত সংখ্যার সমাধান

হ	ন	ন	■	■	অ	ল	ক
কা	■	ট	কা	স	■	ব	ল
র	স	■	ল	কে	ট	■	ক
■	কা	ম	না	■	ন	ক	ল
ঝা	ল	র	■	স	ক	ল	■
ল	■	দ	ম	ন	■	ন	ব
ঝা	উ	■	ক	দ	র	■	না
ল	ল	না	■	■	ত	ফা	ত

শালুক

নিজের হাতে

সদ্যোজাত মুরগির ছানা

উপকরণ: বাসন্তী হলুদ, হলুদ, লাল, হালকা লাল, সাদা, কালো ও আকাশ-নীল রঙের অরিগ্যামি কাগজ, কাঁচি, কম্পাস ও আঠা।

কী ভাবে করবে:

১। কম্পাস দিয়ে ছবি দেখে আকাশ-নীল কাগজ থেকে একটা বড় গোল কেটে নাও।
২। বাসন্তী হলুদ কাগজ থেকে দুটো ছোট আকারের গোল কেটে নাও কম্পাস বসিয়ে।
৩। আর-একটা হলুদ কাগজ থেকে ছবি দেখে দুটো ডানার আকার কেটে ফ্যালো।
৪। লাল কাগজটা কেটে নাও ছবি দেখে পান পাতার আকারে।
৫। হালকা লাল কাগজটা ছবি দেখে চার কোনা করে বরফির আকারে কাটো।
৬। শেষে সাদা আর কালো ছোট ছোট গোল কেটে নাও ছবির জন্য।
৭। বসানোর আগে আকাশ-নীল গোল কাগজটা মাঝখান থেকে ভাঁজ করে ছবি দেখে কাঁচি দিয়ে খাঁজ খাঁজ করে কেটে নাও।

কাটাকুটি শেষ। এ বার ছবিতে যেমন দেখছ, তেমন করেই আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তা হলেই রেডি সদ্যোজাত মুরগির ছানা!

বৈশালী সরকার

মুরগির ছানার উপকরণ

তৈরি হয়ে গেল মুরগির ছানা
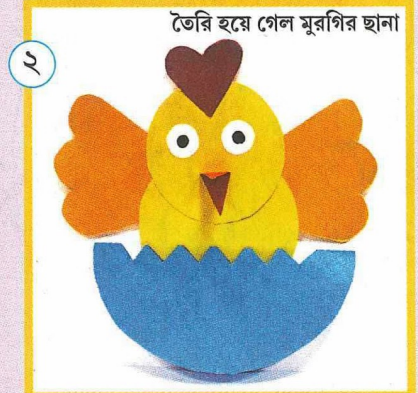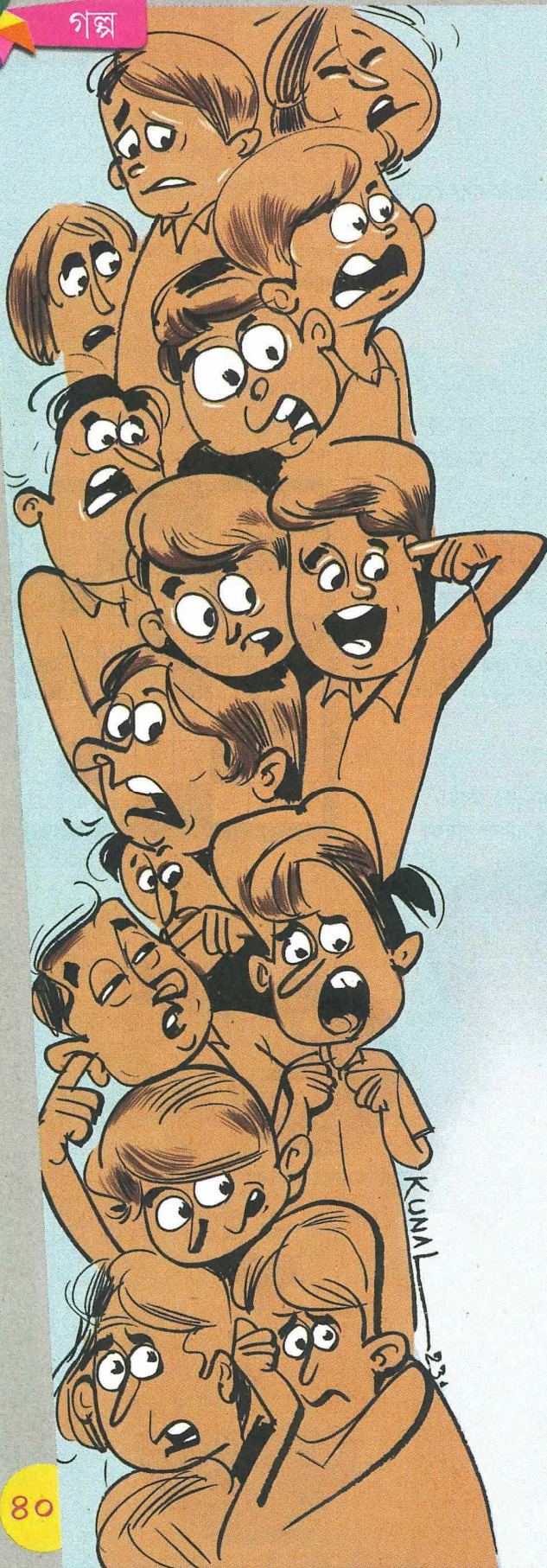
তাসের ক্লাস

সুবর্ণ বসু

আজ বহু দিন পর চার বন্ধুর কথা হচ্ছে। সবার কপালেই চিন্তার ভাঁজ। কারণ একটা ই-মেল। চার জনই পেয়েছে সেটা। উজানী নগর মহেশ সামন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ই-মেল থেকে। পাঠিয়েছেন স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই মাধবেন্দ্র ঘোষদস্তিদার। মেলে লেখা আছে—

আমার সিনিয়ররা,

উজানী নগর মহেশ সামন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়ের বড্ড বিপদ। জমিদার মহেশ

সামন্তর দান করা যে তিনমহলা বাড়িটায় তোমাদের স্কুল চলত, তা অনেক দিন ধরেই ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। এখন পঞ্চায়েত থেকে এটিকে বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুল ফান্ডের অবস্থা সুবিধের নয়। করোনা-পরবর্তী সময় থেকেই ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ কমছে। উঁচু ক্লাসের বহু ছাত্র কেউ গ্যারাজের কাজে, কেউ মোবাইল সারানোর কাজে ঢুকে গেছে। তবে সে সব কথা বলতে এই চিঠি নয়। প্রধান সমস্যা হল, গ্রামের প্রোমোটার জগুপদ বসাক নানা মহলে কলকাঠি নেড়ে স্কুলটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পুরো জায়গাটা ও হাতিয়ে বিলাসবহুল রিসর্ট করতে চায়। আমাদের ছাত্রসংখ্যা যা হওয়া উচিত, বর্তমানে তার চল্লিশ শতাংশ। ফলে অভিভাবকদের নিয়ে বড় করে জনমতও তৈরি করা যাচ্ছে না। স্কুলকমিটির সর্ষের মধ্যেও ভূত আছে, তারাও জগুপদরই সমর্থক।

এই বিপদে তোমাদের কথাই মনে পড়ল। কিছু করতে পারো না স্কুলের জন্য?

কোনও জোরাজুরি নেই বাবারা, যদি করার মতো কিছু না-ও থাকে, মনের উপর বোঝা নিয়ো না। ভবিতব্যকে কেউ আটকাতে পারে না। মানুষ নিমিত্ত মাত্র।

ইতি—

মাধবেন্দ্র

যে চার জন এই মেল পেয়েছে, তাদের নাম হরনাথ, চিরন্তন, ঈশান এবং রোহিত। ওরা উজানী নগর মহেশ সামন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্র। এক সঙ্গে ২০০১ সালে মাধ্যমিক, ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। স্কুলকে তারা এখনও খুব ভালবাসে। এই ই-মেলটা তাদের ভাবাচ্ছে। আলোচনায় বর্তমান সমস্যার সমাধান খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তারা ফিরে যাচ্ছে স্কুলজীবনে। মনে পড়ে যাচ্ছে স্কুলজীবনের নানা মজা আর দুষ্টুমির কথা।

রোহিত বলে, "মনে আছে, ফিজ়িক্যাল সায়েন্সের বিপিনবাবুর কথা? কথার মাত্রাই ছিল, 'সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেল করবি।' আর কী সাংঘাতিক ঘন, মোটা ভুরু! তার নীচে কোটরাগত চোখ। কার দিকে তাকাচ্ছে বোঝা যেত না।"

চিরন্তন বলে, "আমি এক দিন বলে ফেলেছিলাম, স্যারের কী অসাধারণ ভুরু আহা! ঠিক যেন চোখের উপর রামভজন দারোয়ানের গোঁফ! সে কথা স্যারকে কেউ লাগিয়ে দিয়েছিল। স্যর তাতে খেপে গিয়ে আমাকে কী পটাপট স্কেলের বাড়ি!"

ঈশান বলে, "কেন, স্কেলের মার অঙ্কের ক্লাসে আমি খাইনি? সেই রাসুবাবুর হাতে?"

অঙ্কের রাসবিহারী দাস সমস্ত 'ই'-কে 'এ' উচ্চারণ করতেন। যেমন, ত্রেভুজ, থেয়োরেম, স্বতঃসেদ্ধ, এত্যাদি। কঠিন অঙ্ক সল্‌ভ করে বলতেন, "এ সব অঙ্ক রাসবেহারী দাসের হাতের ময়লা।' ছেলেরা রাসবেহারী-কে সংক্ষেপে রাসুবাবু বলত। সেই রাসুবাবুর ভগবান ছিলেন কেশবচন্দ্র নাগ। তাঁর অঙ্কবই ক্লাসে এনে তেল-মাখানো লাঠিতে ছেলেদের বাঁদর-নাচাতে কিংবা তিন-চারটে ফুটোওয়ালা চৌবাচ্চায় হাবুডুবু খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ঈশানের কেশব নাগের বই দেখলে গায়ে জ্বর আসত। সে বলত, "কেশবচন্দ্র নাগের মতো সার্থকনামা লোক দুটো নেই। ইনিশিয়ালগুলো দেখ! কেসিএন— পটাশিয়াম সায়ানাইড!"

রাসুবাবু ক্লাসে কেশব নাগের বইয়ের প্রথম পাতা খুলে দেখাতেন, প্লেটো না অ্যারিস্টটল, কার একটা উক্তির বাংলা, "দেখো ছেলেরা, কী লেখা আছে, 'অঙ্ক হইল আত্মার ঔষধ', বুঝতে পারলে তো?"

তাতে দোষের মধ্যে ঈশান বলেছিল, "ঔষধের দরকার নেই স্যর, আমার আত্মা সুস্থই আছে।"

ব্যস, আর যায় কোথায়! "শেক্ষকের সঙ্গে এয়ার্কি, অ্যাঁ, এত বড় হেম্মত..." বলে চটাপট স্কেলের মারের বৃষ্টি।

হরনাথ এ বার মুখ খুলল, "তোদের তলাপাত্রর কথা মনে নেই?"

বাকি তিন জন এক সঙ্গে বলে উঠল, "মনে থাকবে না আবার!"

তরুণ তলাপাত্র ইতিহাস পড়াতেন। বাংলাও পড়াতেন। আসলে উনি ইতিহাসেরই টিচার। বাংলার মাস্টারমশাই সে বছর রিটায়ার করায়, উনি ঠেকনা দিতেন। ইতিহাস পড়াতেন সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। বাংলা পড়াতেন মাটির দিকে তাকিয়ে। কেন এ রকম করতেন, কেউ জানত না। ছেলেরা বলত, ইতিহাসে আত্মবিশ্বাসী, তাই ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পড়ান। বাংলায় চোখ তুলতে সাহস পান না।

তাঁর ক্লাসে সবচেয়ে বেশি গোলমাল হত। তবে তলাপাত্রর একটা স্বভাব ছিল, হাবিজাবি যে প্রশ্নই করা হোক, তিনি খুব সিরিয়াসলি উত্তর দিতেন, জানা না থাকলেও বানিয়ে বলে যেতেন। সেই বুঝে ছেলেরাও তেমন প্রশ্ন করত।

কেউ হয়তো বলল, "স্যর, গৌতম বুদ্ধ গায়ে হলুদ চাদর দিতেন কেন?"

তলাপাত্রও অমনি সিলিংমুখো হয়ে, "কারণ বৌদ্ধ ধর্মে হলুদ রং ছিল নির্বাণের প্রতীক, মোক্ষপ্রাপ্তির রং..." ইত্যাদি যা মনে আসত টানা বলে যেতেন।

বাংলা ক্লাসে ঝামেলা হত ব্যাকরণ নিয়ে। ব্যাকরণ বইয়ে লেখা ছিল, 'আগাগোড়া' শব্দের ব্যাসবাক্য 'আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত'। অব্যয়ীভাব সমাস। তলাপাত্র খালি বলতেন, "ওটা হবে আগা ও গোড়া— দ্বন্দ্ব সমাস।"

হরনাথ বলেছিল, "তা হলে স্যর, কোনও বই আগাগোড়া পড়া মানে, শুধু শুরু আর শেষটুকু পড়া, তাই তো?"

তলাপাত্র উত্তর খুঁজে না-পেয়ে হরনাথকে নিলডাউন করিয়ে দিয়েছিল।

নাইন-টেনে ক্লাসে টেস্টপেপারও করাতেন তলাপাত্র। এক বার মহীন জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যর, 'আমার সে আশালতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে'— এই বাক্যে আশালতা সমাস করতে দিয়েছে। এটা হবে, আশা ও লতা, দ্বন্দ্ব সমাস, তাই তো?"

তলাপাত্র খেপে গিয়ে বলেছিল, "উজবুক! আশা ও লতা কেন হবে? এটা হবে আশা রূপ লতা। রূপক কর্মধারয়।"

তলাপাত্র বাংলা ক্লাসে এতখানি আত্মবিশ্বাসী কখনও হতেন না। সে দিন ছিল এক বিরল ধরনের দিন।

নাছোড় মহীন বলেছিল, "না স্যর, তা কী করে হবে! 'শিবদুর্গা' যদি শিব এবং দুর্গা হয়, তা হলে, এখানে আশা ও লতা হবে না?"

তলাপাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "বাক্য দেখে মানে বোঝ, ভূত কোথাকার!"

মহীন নির্বিকার, "হ্যাঁ স্যর, এ তো ফাংশনের কর্মকর্তার উক্তি, আশালতা নির্মূল হওয়া মানে, আশা ভোঁসলেও গাইবে না, লতা মঙ্গেশকরও গাইবে না। তাই আশা ও লতা, মানে, দুই বোন। শুনেছি, ওদের মধ্যে হেবি কম্পিটিশন ছিল, কেউ কাউকে জায়গা ছাড়ত না। তাই দ্বন্দ্ব সমাস।"

তলাপাত্র রাগে কথা না খুঁজে পেয়ে ডাস্টার ছুড়ে মারতে গেছিলেন।

ও, একটা কথা বলাই হয়নি। চার বন্ধু গল্প করছে বলে ভেবো না, ওরা সব এক জায়গায় গোল হয়ে বসে গপ্পো করছে।

প্রত্যেকে বাকি তিন জনকে দেখছে একটা ল্যাপটপের স্ক্রিনে। হরনাথ থাকে লুধিয়ানায়। সে এগ্রিকালচার নিয়ে লেখাপড়া করেছে। তার পারিবারিক ব্যবসা বীজ, সার এবং চাষের যন্ত্রপাতির। সে-ই প্রথম পারিবারিক ব্যবসার শাখা খুলেছে পঞ্জাবে। ঈশান থাকে আমেরিকায়, একটা বড় ওষুধ কোম্পানির গবেষণা বিভাগে সে চাকরি করে। রোহিত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, থাকে লন্ডনে। চিরন্তন দুবাইয়ে থাকে, শিপিং কর্পোরেশনের বড় অফিসার। তারা এখন স্কাইপ চ্যাটে কথা বলছে।

রোহিত বলে ওঠে, "আমাদের স্যররা আমাদের ভালবাসতেন, যত্ন করে পড়াতেন। আমরাই না বুঝে তাঁদের অনেক জ্বালিয়েছি। ভুল তো মানুষমাত্রই হয়, আমরা মজার ঝোঁকে হাসাহাসি করেছি... হয়তো ওঁরা কিছু মনে রাখেননি, কিন্তু এখন ভাবলে খারাপই লাগে।"

বাকি তিন জন ওকে সমর্থন করে।

এর মধ্যে হঠাৎই ঈশান বলে ওঠে, "শোন, তোদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি একটু খোঁজখবরও নিচ্ছিলাম হোয়াটস অ্যাপে। তোদের মণিময় সেনগুপ্তকে মনে আছে? আমাদের দু'ব্যাচ জুনিয়র। ক্রিকেট টিমে ছিল। বাঁ-হাতি।"

চিরন্তন বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ... ও তো ডব্লিউবিসিএস পাশ করেছিল শুনেছিলাম। লেখাপড়ায়ও ভাল ছিল।"

ঈশান বলে, "হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। ও এখন সাবডিভিশনাল অফিসার। উজানী নগর ব্লক ওর সাবডিভিশনে নয় ঠিকই, কিন্তু সেখান থেকে বেশি দূরেও নয়। এক বার বলে দেখি। সরকারি অফিসার বলে কথা, কিছু ইনফ্লুয়েন্স কি থাকবে না?"

রোহিত বলে, "আমারও কলকাতায় চেনা সলিসিটির ফার্ম আছে, আইনের ব্যাপারটা ওরা সামলে দেবে।"

হরনাথ বলে, "আমি আগে জগুপদ প্রোমোটারকে সাইজ় করব। জগুপদর টিকি বাঁধা আছে এমএলএ জয়নাথ ভটচাজের কাছে। জয়নাথ আমার দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই। জয়নাথের পার্টিফান্ডে আমার কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা যায়। এ বার জয়নাথ আমাকে রিটার্ন দেবে।"

চিরন্তন বলে, "আমার সে রকম কোনও কানেকশন নেই, কিন্তু যদি টাকাপয়সা লাগে, অন্তত স্কুলবাড়ির সংস্কার হওয়া তো খুবই দরকার। তা ছাড়াও স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস বা কম্পিউটারে অ্যাডভান্সড কোর্স যদি চালু করা যায়। স্কুলটাকে যে আরও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে, সে তো মাধববাবুর মেল থেকেই পরিষ্কার।"

রোহিত বলে, "তবে মণিময়ের কথা শুনে মনে পড়ে গেল, আমাদের ক্লাসের রত্নময়ের কথা। মানে, আমাদের রতনা রে! রোজ একই টিফিন আনত— ডিমসেদ্ধ, চার টুকরো লম্বা লম্বা সেদ্ধ আলুর ফালি, শসা, ছোলা, টমেটো সসের পাউচ। আর আলাদা বক্সে ছানা।"

ঈশান বলে, "আর সেই ডিম নিয়ে তোতাহারুর ক্লাসের সেই ঘটনাটা! সত্যি ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম!"

ভূগোল-শিক্ষক হারানিধি প্রামাণিক নাকি খুব ছোটবেলায় দুর্গা পুজোর মেলায় আধ ঘণ্টার জন্য হারিয়ে গেছিলেন। বছর চারেক বয়সে। তার পর তাঁর নাম রাখা হয় হারানিধি। তাঁর ছিল তোতলামির সমস্যা। ছাত্রদের মনে হয়েছিল তোতলাকে তোতলা বলতে নেই, তাই ছাত্রদের মুখে তার নাম হয়েছিল 'তোতা হারু'।

টিফিনের আগের পিরিয়ডগুলোয় প্রায়ই একটা ঘটনা ঘটত। এই পিরিয়ডে যদি খুব কড়া কোনও স্যরের ক্লাস না পড়ত, তা হলে ছেলেরা বেঞ্চের তলায় টিফিন বক্স খুলে খাওয়াদাওয়ার কাজটা এগিয়ে রাখত, যাতে পুরো টিফিনের সময়টা খেলা যায়।

এক দিন টিফিনের আগে হারানিধির ক্লাস। ফার্স্ট বেঞ্চে রতনা বসে টিফিনবক্স খুলেছে। সবার দিকে পিছন ফিরে বোর্ডে লিখছেন হারানিধি। রতনার ঠিক পিছনের বেঞ্চে তখন ব্যাগ থেকে লম্বা মতো একটা বাঁধানো খাতা বের করে শ্যাডো প্র্যাকটিস করছে হরনাথ। ওটাই ব্যাট। কাগজ ছিঁড়ে পাকিয়ে বল তৈরি করে ওই শক্ত মলাটের লম্বা খাতার ব্যাট দিয়ে খেলা হয়।

এই অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু তার পর পুরো ঘটনাটা মুহূর্তের ভগ্নাংশে ঘটে গেল।

ডিমে টমেটো সস মাখাচ্ছিল রতনা। মাখানো হয়ে যেতে ডিমটা মুখে পুরতে যাবে, আচমকা হারানিধির অ্যাবাউট টার্ন। তিনি ফিরেই দেখেন সামনের বেঞ্চের রত্নময় লাল লাল ছোপ লাগা একটা অদ্ভুত দর্শন ডিম মুখে পোরার জন্য হাঁ করেছে।

হারানিধি অমনি পড়ানো ভুলে গিয়ে "এ ক্-কী! কী খা-খা-খা..." করে উঠেছেন।

চমকেছে রতনাও। চমকের চটে সস-মাখানো পিচ্ছিল ডিমটা তার হাত থেকে ছিটকে মাথার পিছন দিকে উঠে গেছে। সেই কিম্ভূত বস্তু দেখে চমকে উঠে ব্যাট, মানে খাতা চালিয়ে দিয়েছে হরনাথ। আর কী নিখুঁত সংযোগ! ডিমটা সপাটে গিয়ে লেগেছে হারানিধির নাকে।

আর হারানিধি গলা ফাটিয়ে "ও-ওরে বা-বা-বা রে! মে-মে-মেরে ফেললে রে..." বলে চিৎকার। সে কী ভয়ঙ্কর চিৎকার! মনে হল এক্ষুনি কড়িবরগা নেমে আসবে মাটিতে। সারা ক্লাস থমকে চুপ।

চিরন্তন ওয়াটার বটল থেকে জল খাচ্ছিল। ডাইভ মেরে বেঞ্চের তলায় ঢুকে খানিক ক্ষণ পরে বেরিয়ে এল ফোলা গাল নিয়ে। সে বেঞ্চের তলায় ঢুকে ডিমটা তুলে, সস, ধুলো সব ধুয়ে মুখে পুরে দিয়েছে।

"তোতা হারু যতই চেঁচাক, কিছু প্রমাণ করতে পারবে না, কামানের গোলা আমার পেটে," চাপা গলায় বলে হাসে চিরন্তন।

হারানিধি ছিলেন হেড স্যরের খুবই অনুগত। আর হেড স্যর তখন ক্লাসের আশপাশেই ছিলেন। তিনি তো হারানিধির প্রাণান্তকর চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢুকে এসে বাঘাটে গলায় চেঁচিয়ে বললেন, "সাইলেন্স! সাইলেন্স!"

হারানিধি ঘাবড়ে গিয়ে কোঁত করে চিৎকারটা গিলে ফেললেন। হেড স্যর তাকিয়ে দেখলেন হারানিধির নাকের উপর লালচে ছোপ।

হেড স্যর দাঁত চেপে হারানিধিকে বললেন, "বিহেভ ইয়োরসেল্ফ হারাবাবু! এই ভাবে কি মানুষ চেঁচায়? কালীপুজোর রাত্তিরেও এ রকম আওয়াজ হয় না!"

হারানিধি ডুকরে উঠে অনেক ক্ষণ সময় নিয়ে পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন। হেড স্যর বললেন, "নাকে হিট করেছে বলছেন, তা কী হিট করেছে?"

হারানিধি বলল, "জা-জা-জানি না, স্যর... খু-খু-খুব শক্ত স্যর...

রতনা চাপা গলায় বলল, "অনেক বার বাড়িতে বলেছি, কুড়ি মিনিট ধরে ডিম সেদ্ধ করবে না। ডিম আর ডিম থাকে না, পাথর হয়ে যায়।"

ও দিকে হারানিধি অদম্য, বলেই যাচ্ছে, "না-না-নাক ফু-ফু-ফু..."

হেড স্যর বিরক্ত হয়ে বললেন, "ফু-ফু করছেন কেন? ফুটবল লেগেছে?"

"না না ফু-ফুলে গেছে। ক্-কী একটা... হরনাথ ব-ব-ব্যাট দ-দ-দিয়ে আমার না-না-নাকে কী যেন... তা-আ-র পর মা-মা-

মাটিতে পড়ল...”

বিস্তর খুঁজেও সেই বস্তু আর পাওয়া গেল না। চিরন্তনের তত ক্ষণে কুলকুচি করে জল খাওয়া হয়ে গেছে।

অতঃপর ধরা পড়ে হরনাথ। তার ব্যাট থেকেই বলটা ছিটকেছে।

হেড স্যারের চিৎকার, “এটা ক্লাস? না খেলার মাঠ?”

হরনাথ আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করে, “না স্যর, অ্যাক্সিডেন্টালি লেগে গেছে... আমি দেখে মারিনি...”

হেড স্যর আরও খাপ্পা, “বাজে কথা বলার জায়গা পাসনি! দেখে না মারলে ঠিক নাকেই লাগে কী করে... তাকিয়ে দ্যাখ, এখনও স্যরের নাকে রক্ত লেগে আছে।”

যখন জানা গেল, ওটা রক্ত নয়, সস এবং কিছুতেই উড়ন্ত গোলাটির ট্রেস পাওয়া গেল না, কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

শুধু রতনা আফসোস করেছিল, ডিমটা ওর খাওয়া হল না বলে। চিরন্তন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, “হেড়ুর ঠ্যাঙানি থেকে বাঁচলে ওর’ম ডিম অনেক পাবি রতনা। দুঃখু করিসনি। আমাকে থ্যাঙ্কিউ দে, কেমন টাইমিং! তোর ক্ষেপণাস্ত্র গিলে ফেলে প্রমাণ লোপাট করে দিলাম।”

রতনা তো অবাক, “ক্ষেপণাস্ত্র?”

চিরন্তন বলেছিল, “হ্যাঁ। ক্ষেপণাস্ত্র। খুঁজে পেলে তোতা হারু আর হেড়ু কী রকম খেপে যেত দেখতিস!”

সেই হেড স্যর রিটায়ার করার পরই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মাধবেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার। পাঁচ ফুট হাইট। রোগা ডিগডিগে। ময়লা রং। তখন হরনাথ-চিরন্তনরা ক্লাস নাইনে। তারা চালু করে দিল ‘মেধো’ নামটা।

প্রথম ক্লাসে সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র। হরনাথ-চিরন্তন-ঈশান আর রোহিত পাশাপাশিই বসত। পর পর তাদের নাম শুনে মুচকি হাসলেন মাধবেন্দ্র, তার পর বললেন, “হরতন, চিঁড়েতন, ইস্কাবন আর রুইতন, অ্যাঁ! ক্লাসে তো তাসের দেশ বসিয়ে দিয়েছ দেখছি!”

বন্ধুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। তার পর শুরু হল মুগ্ধতার পালা। হেড স্যরের বিষয় জীবন বিজ্ঞান। ফার্স্ট বেঞ্চের তমোনাশ বই দিতে গেলে, তিনি বারণ করলেন। বললেন, “পড়া কি পুস্তকে থাকে বাবা! থাকে মস্তকে।”

বলে পড়াতে শুরু করলেন। দেখা গেল, অসাধারণ পড়ান ভদ্রলোক। যেন গল্প করছেন। মজার কথা বলছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে পড়ার কথাগুলো এমন ভাবে সাজিয়ে দিচ্ছেন, মনে রাখার সহজ উপায়সুদ্ধু যে, ক্লাসের পড়া ক্লাসেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। গোটা ক্লাস মাধবেন্দ্রর ফ্যান হয়ে গেল। তাঁর পড়ানোর গুণেই তার পর থেকে সকলের প্রিয় বিষয় হয়ে উঠল জীবন বিজ্ঞান।

কিন্তু কালক্রমে মাধবেন্দ্রর কানে উঠল মেধো নামটাও। নানা কৌশলে এটাও তিনি বের করে ফেললেন, নামকরণটি কাদের কীর্তি। ডাক পড়ল চার বন্ধুর।

মাধবেন্দ্র প্রথমেই বললেন, “তা তাসকুমাররা, হেডমাস্টারমশাইকে নাম ধরে ডাকার কারণটা কী?”

রোহিতের কেমন যেন মনে হয়েছিল, স্যরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যেতে পারে। সে বলেছিল, “আসলে স্কুলে আমরা আপনার চেয়ে সিনিয়র তো, তাই...”

অবাক হয়ে মাধবেন্দ্র বলেছিলেন, “তোমরা সিনিয়র! কী রকম?”

রোহিত বলেছিল, “স্যর, আমাদের স্কুলে ন’বছর হয়ে গেল, আর আপনি কয়েক মাস হল এসেছেন...”

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন মাধবেন্দ্র। তার পর থেকে সম্পর্কটা বন্ধুর মতো হয়ে যায়। ছেলেদের মুখে মেধো ক্রমশ ‘মাধববাবু’ হয়ে ওঠে। মাধববাবুও ওদের মজা করে ‘সিনিয়র’ বলে ডাকতেন। স্কুলে ওদের ব্যাচটার নামও হয়ে গিয়েছিল ‘তাসের ক্লাস’। স্কুল ছাড়ার পরও সরস্বতী পুজোর দিনগুলোয় বন্ধুরা মিলে স্কুলে গেলে দেখা হত। যোগাযোগটা ফিকে হয়ে আসে।

ওরা স্কুল ছাড়ার বছর কুড়ি পর প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন থেকে ওদের মেল আইডি সংগ্রহ করেছিলেন হেড স্যর। বছর পাঁচেক আগে রিটায়ার করার পর তিনি গভর্নিং বডির সদস্য হয়েছিলেন, তাই তিনি এখনও স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

মাধবেন্দ্রর মেল পাওয়ার পর চার বন্ধুর যে গোল টেবিল বৈঠক হল, তার পর সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। চার বন্ধুই যথাসম্ভব তাদের যোগাযোগ খাটিয়েছে। কিন্তু ও দিকে দেশে দুশ্চিন্তার বিপুল চাপ সামলাতে পারেননি মাধবেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার। হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

স্কুল থেকে খবর পেয়ে চার বন্ধু অবাক। ওরা স্যরকে জানিয়েছিল, স্যর যেন চিন্তা না করেন, ওরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেবে।

হেড স্যরের অসুস্থতার খবর পেয়ে চার বন্ধুই ঠিক করল, কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে যাবে উজানী নগর। স্যরের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তিন দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা নিয়ে রওনা হল ওরা। তত দিনে এসডিও মণিময় সেনগুপ্ত প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে উজানী নগর ব্লকের বিডিও-কে। কলকাতার সলিসিটর ফার্ম থেকে দু’জন সিনিয়র আইনজীবী উজানী নগরে গিয়ে পৌঁছেছেন। মহেশ সামন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়ের তরফ থেকে নোটিস ধরানো হয়েছে প্রোমোটার জগুপদ বসাককে। সে আবার দাবড়ানি খেয়েছে এমএলএ জয়নাথ ভটচাজের কাছেও। সব মিলিয়ে অবস্থা ধীরে ধীরে অনুকূল হচ্ছে। কলকাতার দু’টি নামী সংস্থা এই স্কুলে কম্পিউটার এবং স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ব্যবস্থা করছে।

চার বন্ধুর বড় গাড়িটা যে দিন উজানী নগরে এসে পৌঁছল, সে দিন মাধবেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার অনেকটাই সামলে উঠেছেন। তিনি সব খবর পেয়ে অনেকটাই চিন্তামুক্ত। তাঁকে জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছে।

বাইরে অপেক্ষা করছিল চার বন্ধু। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে মাধবেন্দ্রর কেবিনে ঢোকে হরনাথ, চিরন্তন, ঈশান এবং রোহিত। মাধবেন্দ্র তাঁদের দেখে হাসার চেষ্টা করেন। ছোট্ট ছোট্ট বিচ্ছুগুলো আজ পরিণত। কিন্তু তাদের চিনতে দেরি হয় না। দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে তিনি দেখেছেন, মানুষের চোখ কখনও বদলায় না।

তিনি সামান্য হাত নাড়িয়ে তাঁদের কাছে ডাকেন। খাটের দু’পাশে দু’জন করে গিয়ে দাঁড়ায়। মাধবেন্দ্রর হাতে চ্যানেল করা, জায়গায় জায়গায় ব্যান্ডেজ। খুব সাবধানে চার জন মাধবেন্দ্র হাত স্পর্শ করে।

গভীর তৃপ্তিতে চোখ বোজেন মাধবেন্দ্র। তার পর ক্ষীণ স্বরে থেমে থেমে ডাক্তারকে বলেন, “আর চিন্তা নেই ডাক্তারবাবু। চারটে রঙের টেক্কাই এখন আমার হাতে। আর আমাদের কেউ হারাতে পারবে না। আমাকেও নয়, আমাদের স্কুলকেও নয়।”

রঙের টেক্কাদের চোখে তখন আচমকাই সব রং ঝাপসা।

ছবি: কুনাল বর্মণ

ভ্রমভোলা

বিক্রম অধিকারী

পত্রিকা দফতর থেকে ফোন এসেছে, “পূজাবার্ষিকীর জন্য গল্প চাই।” হাতে মাত্র ক’দিন। স্নানের সময় ভোলাবাবুর চিন্তায় একটি জবরদস্ত গল্পের প্লট ভেসে ওঠে। তিনি তক্ষুনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাতায় প্লটটি লিখে রাখেন। আয়নায় নিজের হুলিয়া দেখে তিনি

এক ছুটে বাথরুমে। প্লট খুঁজে পাওয়ার আনন্দে প্রায় আর্কিমিডিস হয়ে যাচ্ছিলেন!

ভোলাবাবু মিলনী পাঠাগারে গিয়ে নানা বই হাতড়াতে থাকেন। ক'ঘণ্টা পর লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে দেখেন, তাঁর মোটর সাইকেল হাওয়া। বার কয়েক বাইকের চাবি হারিয়েছেন। তাই আর বাইকের চাবি ইগনিশন সুইচ থেকে বের করতেন না। চাবি হারানো রুখতে গিয়ে বাইকটাই চুরি গেল। পকেটে হাতড়ে দেখেন মোবাইল নেই। মনে পড়ে, রাস্তায় তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে তিনি ফোনটা বাইকের ডিকিতে রেখেছিলেন। কয়েক বার ফোন হারিয়েছেন। এখন মোবাইলে নেট ও লোকেশন অন করাই থাকে। তাঁর স্কুলের বন্ধু, কোরক বক্সী থানার আইসি। কোরকবাবু পুরো ব্যাপারটা জেনে বলেন, "ঘাবড়াস না। বাইক পেয়ে যাবি।"

বাড়িতে ফিরে ভোলাবাবু বাইক চুরির ব্যাপারটা পুরো চেপে যান। ল্যান্ডফোন বাজে। তাঁর ছেলে বাপ্পি ফোন ওঠায়, "হ্যালো?"

ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে, "আমি ধূপগুড়ি থানার আইসি বলছি।"

থানার কথা শুনে বাপ্পি আতঙ্কে চিৎকার করে, "মা, পুলিশ!"

ভ্রমরদেবী ফোন ধরেন, "হ্যালো?"

"এটা কি ভোলানাথ চক্রবর্তীর বাড়ি?" ভ্রমরদেবীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা, "হ্যাঁ। আমি ওঁর স্ত্রী বলছি।"

"বৌদি, আমি ভোলার বন্ধু কোরক। আজ ওর বাইক চুরি হয়েছিল। বাইক চোর জিনিসসমেত ধরা পড়েছে। ছোকরার নাম অস্মিত মৈত্র। ও নাকি আপনার ভাই?"

ফোন রেখে ভ্রমরদেবী গর্জে ওঠেন, "বাবা লাউ-চিংড়ি খুব ভালবাসে। লাউ-চিংড়ি দিতে পাঠিয়েছিলাম বলে এ ভাবে প্রতিশোধ নেবে? আমার ভাই চোর?"

ভ্রমরদেবী ব্যাগে জামাকাপড় গোছাতে শুরু করেন, "এখানে আর এক মুহূর্ত থাকব না।"

ভোলাবাবু সাংঘাতিক ভুলটা বুঝতে পারেন। লাউ-চিংড়ি নিয়ে দুপুরে ভ্রমরদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অস্মিত সবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে। তিনি ক'দিনের জন্য ওকে বাইকটা চালাতে দিয়েছিলেন। গল্পের চিন্তাভাবনায় বিভোর ভোলাবাবু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

তিনি আইসি-কে ফোনে বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, "অস্মিত না আমিই আসল অপরাধী। বন্ধু, ওকে ছেড়ে দে।"

আইসি-র গলা ভেসে আসে, "পুলিশ মুখ দেখেই মানুষ চিনতে পারে। অস্মিত ইনোসেন্ট, সেটা ওকে দেখেই বুঝেছি।"

"ইস, আমার ভুলে ছেলেটি কী হ্যারাস হল।"

"ভোলা, তোর ভোলার অভ্যেস এখনও গেল না রে বন্ধু। মনে আছে, এক বার পরীক্ষার খাতায় নিজের নাম না লিখে আমার নাম লিখেছিলি?"

অস্মিত আসতেই ভ্রমরদেবী জ্বলে ওঠেন, "ভাই খবরদার, মানুষের বাইকে হাত দিবি না।"

ভ্রমরদেবী ব্যাগ নিয়ে বের হন। লজ্জিত ভোলাবাবু অস্মিতের হাত ধরেন, "ভাই, ক্ষমা করে দিস।"

অস্মিত ভোলাবাবুকে বাইকের চাবি দেয়, "জামাইবাবু, চাপ নেবেন না। পুজোয় কিন্তু জম্পেশ গল্প চাই।"

উৎফুল্ল বাপ্পি হাততালি দেয়, "তাই তাই তাই, মামা বাড়ি যাই/ বাবার এখন ভারী মজা, মা-র চিৎকার নাই!"

ভোলাবাবু ভ্রমরদেবীকে শুনিয়ে বলেন, "বুঝলি বাপ্পি, অত মনে রাখতে পারলে ডিএম অফিসের বড়বাবু না হয়ে ডিএম হতাম।"

গল্পটা লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু গল্পের পাণ্ডুলিপিটা বেপাত্তা। লোডশেডিং। মোমবাতি জ্বালিয়েই ভোলাবাবু ফের প্রথম থেকে গল্পটা লেখা শুরু করেন। লেখা প্রায় শেষের দিকে। মোবাইল বেজেই চুপ। কার মিস্‌ড কল? ভোলাবাবু টর্চ জ্বালিয়ে মোবাইল খুঁজতে থাকেন। ধুস, মোবাইলটা যে কোথায়? ল্যান্ডফোন দিয়ে নিজের মোবাইলে কল করেন। ওঁর হাতেই মোবাইল বেজে ওঠে। গল্প লেখায় মগ্ন ভোলাবাবু মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে মোবাইলটা খুঁজছিলেন!

এ বার ল্যান্ডফোন বাজে। ভোলাবাবু ফোন ওঠান। অপর প্রান্তে ভ্রমরদেবীর গলা, "ফ্রিজে মাছের ঝোল আছে। প্রেশার কুকারে চাল-জল রেখে এসেছি। একটু সিটি মেরে নিয়ো। গ্যাসের রেগুলেটর বন্ধ কোরো। রাতে ওষুধ খেতে ভুলো না।"

ভোলাবাবু বলেন, "আর কিছু বলবে?"

"খবরে দেখলাম, ওভার চার্জিংয়ের কারণে মোবাইলের ব্যাটারি ফেটে এক জন মারা গেছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। তুমি তো ফোন চার্জে বসিয়ে রাতে ঘুমোতে যাও।"

"আচ্ছা, ব্যাটারি খুলে মোবাইল চার্জ-এ বসাব," ভোলাবাবু মিথ্যে বলেন, "বাইক চালাচ্ছি। এখন রাখছি।"

ফের ল্যান্ডফোন বাজে। ফোন ওঠাতেই ভ্রমরের হুঙ্কার, "তুমি বাইক চালাতে চালাতে ল্যান্ডফোনে কথা বলছ? ব্যাটারি খুলে রেখে মোবাইল চার্জে বসাবে? প্রত্যেক বার পুজোর আগে তোমার ঘাড়ে গল্পের ভূত চাপে। দাঁড়াও, সকালেই বাড়ি আসছি। এ বার এই গল্পের ভূত আমি ছাড়াবই।"

ভোলাবাবুর নির্লিপ্ত গলা, "গল্পে আমার এনার্জি।"

ভ্রমরদেবী ফোঁস করেন, "গল্পে আমার অ্যালার্জি।"

গল্পটার ঠিক জুতসই নাম পাওয়া যাচ্ছে না। এক কাপ কড়া চা পেলে বেশ হত। ভোলাবাবু হাঁক দেন, "এক কাপ চা দাও না।"
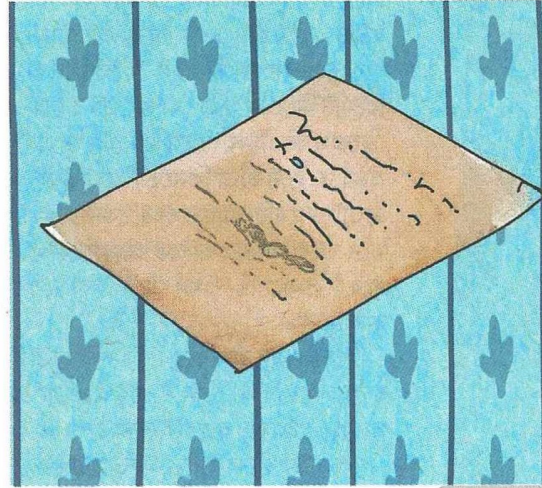
অনেক ক্ষণ হয়ে গেল, চা এল না। ভোলাবাবু একাই হাসেন, চা কে দেবে? আজ এই গল্পের কারণেই না ভ্রমর বাবার বাড়ি গিয়ে উঠেছে। ভোলাবাবু নিজে চা বানাবেন। ওঁর হাতেই জ্বলন্ত মোমবাতি। কিন্তু তিনি হন্যে হয়ে লাইটার-দেশলাই খুঁজতে থাকেন।

॥ ২ ॥

কুয়াশার মতো ফিনফিনে বৃষ্টি ওড়াউড়ি

করছিল। ভোলাবাবু ছাতা মাথায় অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন। ভ্রমরদেবী জিজ্ঞেস করেন, "নতুন ছাতা কিনলে? এই বর্ষায় এটা চার নম্বর।"

"উঁহু," ভোলাবাবুর মুখে গর্বিত হাসি, "হুঁ-হুঁ দ্যাখো, আজ ছাতা হারাইনি!"

ভ্রমরদেবী তেতে ওঠেন, "আজ তো ছাতা নিয়েই যাওনি। অন্যের ছাতা, খবরদার এটা যেন না হারায়।"

সন্ধেয় ভোলাবাবু হাঁটতে বেরোন। গল্পটার নামের তল্লাশে বিভোর ভোলাবাবু হেঁটেই চলেছেন। দেওমালি বাজারে এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা, "আরে ভোলাদা, হেঁটে হেঁটে এত দূর চলে এলে! গনগনে জ্যোৎস্নার তাপ থেকে বাঁচতেই কি তোমার মাথায় ছাতা?"

ভোলাবাবু বাহানা দেন, "বেরোনোর সময় বৃষ্টি পড়ছিল।"

ছাতা হারানোর ভয়ে ভোলাবাবু বৃষ্টিতেও ছাতা নিয়ে বেরোন না। তিনি ভেবে-ভেবে হাবুডুবু, 'আচ্ছা ছাতা নিয়ে বেরোলাম কেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভ্রমরই তো ছাতাটা দিয়েছিল। কিন্তু কেন দিয়েছিল? ধুস, এত না ভেবে ফোন করলেই তো হয়!' তিনি পকেট হাতড়ান। 'দূর ছাই, আবার মোবাইল ফেলে টিভির রিমোট নিয়ে এসেছি।' আচ্ছা, ভ্রমর তো জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছাতা কিনলে?' হুম, ভ্রমর তা হলে ছাতা কিনতেই বলেছিল। ছাতাটা দিয়েছিল যাতে ছাতা কেনার কথা মনে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আজ অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন হেঁটে ফেরা চাপ হয়ে যাবে।

ভোলাবাবু বাস ধরেন। অন্যের ছাতা হারালে মুশকিল। তিনি নীরবে আওড়াতে থাকেন, "আমার হাতে অন্যের ছাতা।"

কন্ডাক্টর হাঁকে, "দাদা, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।"

চিন্তামগ্ন ভোলাবাবু বলেন, "তাড়া আছে। বসার সময় নেই।"

বাস থেকে নেমে ভোলাবাবু দেখতে পান শপিং মলের বাইরে লেখা, 'দু'হাজার টাকার কেনাকাটায় ছাতা ফ্রি'। ফ্রি ছাতার লোভে দরকারি জিনিসের সঙ্গে ভোলাবাবু কিছু অদরকারি জিনিসও কিনে ফেলেন।

॥ ৩ ॥

"কী গো, গেলে একটা ছাতা নিয়ে। এখন হাতে দুটো ছাতা। তুমি কি ছাতাচোর হয়ে গেলে?"

ভোলাবাবু ভ্রমরের হাতে ফ্রি-তে পাওয়া ছাতাটা দেন, "দু'হাজার টাকার জিনিস কিনে ফ্রি পেলাম।"

"দু'হাজার টাকার কী উপহার কিনলে?"

ভোলাবাবু আকাশ থেকে পড়েন, "কিসের উপহার?"

"বিয়েবাড়ির কথা ভুলে গেলে," ভ্রমরদেবী ভোলাবাবুর হাত থেকে অফিস থেকে আনা ছাতাটা ছিনিয়ে নেন। সেটা উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে বলেন, "বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও ছাতাটা দিয়েছিলাম কেন?"

বাম্বি মুচকি হেসে মা'র গলা নকল করে, "যাতে ছাতাটা দেখে মনে পড়ে, একটা উপহার কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

ভ্রমরদেবী চিৎকার করেন, "উপহার না কিনে ভুলুবাবু এত রাতে বাড়ি ফিরলেন। দু'হাজার টাকা দিয়ে কী ছাই কিনলে দেখি?"

ভোলাবাবুর হাত খালি। ফ্রি ছাতার খুশিতে দু'হাজার টাকার জিনিসপত্র শপিং মলেই ছেড়ে এসেছেন। ভোলাবাবু হন হন করে বেরিয়ে যান।

ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, 'আমার নামেই আছে 'ভোলা'। ফোনে অ্যালার্ম বাজলে মনে পড়ে না, কেন অ্যালার্ম দিয়েছিলাম। জরুরি কাজের জন্য তড়িঘড়ি ঘরে এসে জরুরি কাজটাই ভুলে যাই। সে দিন ভুলে গামছার উপর প্যান্ট চাপিয়েই অফিসে হাজির হয়েছিলাম। এই যুগে নতুন উৎপাত 'পাসওয়ার্ড'। পাসওয়ার্ড বুঝি বানানোই হয় ভোলার জন্য। হ্যাঁ, 'ফরগট পাসওয়ার্ড' অপশন ডিজিটাল দুনিয়ার সেরা আবিষ্কার। সবাই তো কত কী ভুলে যায়। এক দিন আইনস্টাইন নিজের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভিতর থেকে বলেন, "আইনস্টাইন বাড়িতে নেই।"

'ভাবনায় বুঁদ আইনস্টাইন নাকি বাড়ির দরজা থেকে ফিরে গিয়েছিলেন।'

মোড়ে পুলিশ! কী মুশকিল, এত রাতেও পুলিশ বাইকের কাগজপত্র দেখছে। ভোলাবাবু সটান পাশের গলিতে চলে যান। ভুল বুঝতে পেরে ভোলাবাবু একাই হাসেন, 'ধুস, পুলিশ আমার কী করবে! আমি তো হেঁটেই যাচ্ছি।' শপিং মলে ফেলে আসা জিনিসগুলো নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

ভ্রমরদেবী বলেন, "কী উপহার কিনলে?"

এই যা! উপহার কেনার কথা মনেই নেই। ভোলাবাবু ব্যাপারটা সামলে নেন, "ইচ্ছে করেই কিনিনি। পাঁচ মিনিটে রেডি হচ্ছি। চলো, যাওয়ার সময় তোমার ইচ্ছে মতো কিনে নিয়ো।"

ভোলাবাবু স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে রওনা দেন। বাইকে উঠেই ভ্রমরদেবী নাক সিঁটকান, "ওয়াক! ছিঃ, বাইকে কী দুর্গন্ধ!"

ভোলাবাবু বাইক থামান। ভ্রমরদেবী দূরে সরে দাঁড়ান। ডিকি খুলতেই ভোলাবাবুর মনে পড়ে, সে দিন ঝালটিয়া থেকে গিলান্ডি নদীর টাটকা সরপুঁটি-বোরোলি কিনেছিলেন। তিনি পচা মাছের থলেটা ডাস্টবিনে ছুড়ে দেন। বাম্বি চিৎকার করে, "মা, মা, বাবা মাছ ফেলে দিল।"

ভোলাবাবু বলেন, "ছিঃ, পচা! এক জন এই শুঁটকি মাছগুলো দিয়েছিল।"

খানিকটা গিয়েই তিনি বাইক ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেন। ভ্রমরের গলায় বিরক্তি, "আবার কী ভুললে?"

"পচা মাছ ধরে অস্বস্তি হচ্ছে। একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসি।"

ভোলাবাবু ঘরে গিয়েই বেরিয়ে আসেন। ভ্রমরদেবীর অনুমান, "ঠিক কিছু ভুলে গিয়েছিলে।"

ভোলাবাবুর অপরাধী গলা, "টাকা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

বাম্বি বলে, "আরে বাবা, মা-র কাছেও তো অনেক টাকা থাকে।"

"হ্যাঁ! এটা তো ভাবিনি।"

ভ্রমরদেবী ফোঁস করেন, "আচ্ছা, তুমি তো বাইকের কাগজের সঙ্গে সব সময় ইমার্জেন্সির জন্য কিছু টাকা রাখতে।"

ভোলাবাবু বাইকের ডিকি খোলেন। বাইকের কাগজের ভাঁজে রাখা ক'টা পাঁচশো টাকার নোট তুলে ধরেন, "হুঁ-হুঁ, ইমার্জেন্সি ফান্ড! সব সময় সঙ্গেই থাকে।"

ভ্রমরদেবী রাগে হিস হিস করেন, "সঙ্গে গুচ্ছের টাকা ছিল। তবু টাকা নিতে বাড়ি এসেছে!"

ঘুম-খিদের ঠ্যালায় বাম্বি বিদ্রোহ করে, "আমি আর যাব না।"

ভ্রমরদেবী দুমদাম পা ফেলে বাড়িতে

ঢোকেন, "এই রাতে কি আর দোকান খোলা আছে? এত রাতে বিয়েবাড়ি গিয়ে কি এঁটো-কাঁটা গিলব?"

ভোলাবাবুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, "একদম। এত রাতে না গিয়ে বরং কাল গেলেই হবে।"

ভ্রমরদেবী গজ গজ করেন, "সে দিন, বৌভাতের আগের দিন তোমার বন্ধুর বাড়ি হাজির হলে। তোমার ভুলেই দু'জায়গায় অনুষ্ঠানের পরের দিন গিয়ে হাজির হয়েছি।"

॥ ৪ ॥

ডা. নিলয় সেনগুপ্তের অপেক্ষায় ঠায় বসে ভোলাবাবু, গল্পটির মানানসই নামের খোঁজে নিমগ্ন হয়ে আছেন। ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট চিৎকার করে, "ভোলানাথ চক্রবর্তী, ভোলানাথ চক্রবর্তী।"

ভোলাবাবু চেম্বারে যান। ডাক্তারবাবু গম্ভীর, "পেশেন্ট কোথায়?"

"আমিই পেশেন্ট।"

"কী সমস্যা, বলুন।"

"আমি সব কিছু ভুলে যাই।"

ভুলোমনা পেশেন্টের থেকে প্রথমেই টাকা নিয়ে নেওয়া উচিত। ডাক্তারবাবু বলেন, "আমার কনসাল্টেশন ফি পাঁচশো টাকা।"

ভোলাবাবু পাঁচশো টাকা দেন। ডাক্তারবাবু বলেন, "হ্যাঁ এ বার, আপনার সমস্যা বলুন।"

"কেন যে এখানে এলাম...ভুলে গেছি।"

ডাক্তারবাবুর রাশভারী গলা, "হ্যাঁ, ভুল জায়গায় এসেছেন। ডা. বাসুর কাছে যান।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির গলায় বিরক্তি, "নিরাময়-এ যান। ওখানে সাইকায়াট্রিস্ট ডা.কল্লোল বাসু বসেন।"

বাড়ি ফিরতেই ভ্রমরদেবী তেড়ে ওঠেন, "কী গো, তোমার হাতে এই ব্যাগ? তুমি আমাদের বাড়িতে যাওনি? বাম্বি কোথায়?"

ভোলাবাবু রেগে যান, "তুমিই তো বাম্বিকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বললে।"

ভ্রমরদেবী হতাশ, "উফ, কী ভুলভাল লোক! মোচার ঘণ্ট রেঁধে পাঠালাম। বাবা খেতে খুব ভালবাসে। উনি ঘণ্ট না রেখে ছেলেকে রেখে এলেন!"

ভোলাবাবু গুম হয়ে বসে আছেন। ভ্রমরদেবী বিদ্রুপ ছেটালেন, "ভেজা দশ টাকার মতো নেতিয়ে আছ কেন? গল্পের নাম খুঁজতে খুঁজতে গল্পটাই হারিয়ে গেল নাকি?"

ভোলাবাবুর ম্লান স্বর, "আচ্ছা, আমি কি পাগল?"

"যাক, এত দিনে নিজেকে চিনতে পারলে। বিয়ের ক'দিন পর আমরা শপিং মলে গিয়েছিলাম। আমাকে রেখে তুমি একা একাই চলে এসেছিলে। এক দিন তো আমাকে ঘরে তালা দিয়েই অফিসে চলে গেলে," ভ্রমরের সিরিয়াস গলা, "তখনই আঁচ করেছিলাম।"

ভোলাবাবু যুক্তি খাড়া করেন, "ত্রিশ বছর অবিবাহিত ছিলাম। তাই প্রথম প্রথম ভুলে যেতাম আমি বিবাহিত।"

"তাই বলে কি কেউ বউয়ের নাম ভুলে যায়? 'বোলতা-মৌমাছি-ভোমরা' কী সব উটকো নামে আমাকে ডাকতে। তুমি পাগল না, বদ্ধ পাগল— মানসিক রুগি।"

"উঁহু, পাগলামিটা মানসিক না শারীরিক।"

ভ্রমরদেবীর কণ্ঠে শ্লেষ, "পাগলে কী না বলে!"

ভোলাবাবু যুক্তি দেন, "দ্যাখো, মাথা গন্ডগোল মানে পাগল। 'গণ্ড' মানে 'গলা', আর 'পাগল'-এ আছে 'পা'। বুঝলে, পাগলামিটা মাথা-গলা-পা রিলেটেড কেস।"

ভ্রমরের গলায় বিরক্তি, "সব তালগোল পাকিয়ে দিলে।"

"হ্যাঁ, 'গোল'-ই আসল কালপ্রিট। গোল যোগ হলেই, গোলযোগ। পা গোল হলে পাগল, খেপা। গাল গোল হলেই গোলগাল, মোটা। গণ্ড গোল হলে..."

ভোলাবাবুকে থামিয়ে ভ্রমরদেবী জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, তোমার গল্পটার খবর কী?"

ভোলাবাবু ড্রয়ার খুলে একটা পাণ্ডুলিপি ভ্রমরদেবীর হাতে দেন, "একটু পড়ে দেখবে?"

পাণ্ডুলিপিটার ক'পাতা উল্টে-পাল্টে ভ্রমরের দু'চোখ রসগোল্লা, "অসাধারণ!"

ভোলাবাবুর বিষণ্ণ গলা, "না পড়েই, ঠাট্টা করছ?"

"গল্পটা তো তোমার আত্মজীবনী! পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছি।"

"কখন পড়লে?"

"বাবার বাড়িতে। এই গল্পটার চক্করে ইদানীং সব ভুলে যাচ্ছিলে। অতিষ্ঠ হয়ে আমি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটা বাবার বাড়িতে রেখে এসেছি। অবিশ্বাস্য, গল্পটা ফের হুবহু নামিয়ে ফেললে! তুমি লা জবাব।"

"গল্পটির যথাযোগ্য নাম খুঁজে পাচ্ছি না গো।"

"আমার নামে আছে 'ভ্রম'। তোমার নামে 'ভোলা'। 'ভ্রমভোলা' কেমন হবে?"

ভোলাবাবু দু'হাত উপরে তোলেন, "অসামান্য! এ রকম নামই তো খুঁজছিলাম!"

"আমার দোষে একই জিনিস দু'বার লিখতে হল। সরি, ক্ষমা করে দিয়ো।"

"একটা পাগলকে সহ্য করে যাচ্ছ। আমারই তো ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

ভ্রমরদেবী তেড়ে ওঠেন, "তোমাকে কে পাগল বলে?"

ভোলাবাবু মিইয়ে যান, "ডা. নিলয় সেনগুপ্ত।"

ভ্রমরদেবী খিলখিলিয়ে ওঠেন, "হায় ভগবান! আরে বাবা, ডা. সেনগুপ্ত তো চাইল্ড স্পেশালিস্ট। তোমাকে বলেছিলাম, বাবার বাড়ি হয়ে বাম্বিকে ডাক্তার দেখিয়ে এসো। তুমি নিজেকে দেখিয়ে এলে!"

ভোলাবাবুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, "আহ, তা হলে আমি পাগল নই!"

"অনেক নামী লেখকও কিন্তু এ ভাবে অবিকল গল্প নামাতে পারবে না।"

"দাঁড়াও, এখন থেকে পাণ্ডুলিপির কপি মোবাইলে রেখে দেব।"

"আরে ভোলামন, তোমার মোবাইলও তো হারিয়ে যায়।"

"আইডিয়া! এক কপি করে ফোটোকপি রেখে দেব।"

"আবার ফোটোকপির চক্কর! মাঝে মাঝেই তো বাতিল কাগজপত্র ফেলে দাও। বাতিল কাগজগুলো ফেলার আগে সেগুলোর ফোটোকপি কোরো না আবার।"

ভোলাবাবুর মুখে নির্ভেজাল হাসি, "গত বার পুজোসংখ্যার জন্য লেখার খুব চাপ ছিল। অফিসের পুরনো অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাতিল করার আগে এই ফোটোকপি করার ভুলটাই করেছিলাম!"

ছবি: সৌমেন দাস

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন ‘দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স’-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

দীপসুন্দর দিন্দা

10 মহিলাদের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন দেশ?

1 সুকুমার রায়ের ‘বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে...’ বিখ্যাত এই পঙ্‌ক্তিগুলো সবার চেনা। কবিতাটির নাম কী?

2 মণিবেন প্যাটেল ছিলেন এক জন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সংসদ সদস্য। তাঁর বিখ্যাত বাবার নাম কী?

সুকুমার রায়

9 আমাদের পরিচিত এই যানবাহনটিকে ফ্রান্সে বলা হত ‘পালানকিন’। প্রায় হারিয়ে যেতে বসা এই যানবাহনকে আমরা কী নামে জানি?

3 সবচেয়ে কমবয়সি হিসেবে বিশ্বকাপ আর্চারিতে ব্যক্তিগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির গড়লেন কোন ভারতীয় তিরন্দাজ?
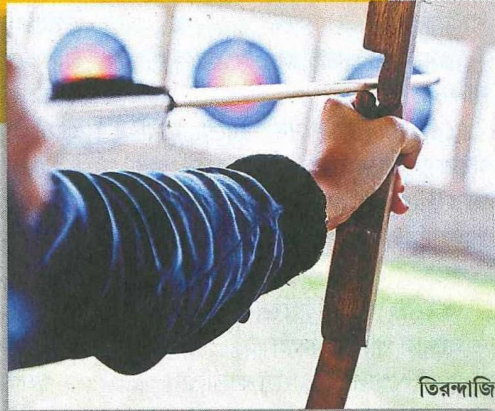
তিরন্দাজি

4 এই বাঙালি সাংবাদিক তথা সাহিত্যিকের এ বছর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি ‘রূপদর্শী’ ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করেছেন, কে তিনি?

5 চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় পালমোনোলজিস্ট কাদের বলা হয়?

6 বিশ্ব আদিবাসী দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

7 বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকর্ম গুয়ের্নিকা কোন চিত্রশিল্পীর আঁকা?

8 প্রতি বছর মালাবার রিভার ফেস্টিভ্যাল কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

চিকিৎসক

৫ অগস্ট সংখ্যার উত্তর

১। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
২। স্পেন।
৩। জলপাইগুড়ি।
৪। উত্তর প্রদেশ।
৫। আল-বিরুনি।
৬। ভাগীরথী নদী।
৭। সেলভা প্রভু।
৮। ঘাস-সংক্রান্ত বিষয়ে।
৯। স্পিনোজ়া পুরস্কার।
১০। রোহিণী।

সঠিক উত্তরদাতা

আয়ুষ্মান দাস, *তৃতীয় শ্রেণি, বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম শিক্ষায়তন, পূর্ব মেদিনীপুর।*
বৈশালী পোদ্দার, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।*
বিতান পোদ্দার, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।*
সৌম্যকান্ত সেন, *সপ্তম শ্রেণি, পার্ল রোজ়ারি ইস্কুল, ডানকুনি, হুগলি।*
আরুষ ঘোষ, *ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট স্টিফেন স্কুল, হাবড়া।*
আফতাব আলম, *সপ্তম শ্রেণি, বরানগর রামেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা।*
অনিরুদ্ধ সিংহ, *সপ্তম শ্রেণি, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়(উ.মা.), বনগাঁ।*

ভ্রম সংশোধন
৫ অগস্ট সংখ্যায় ভুলবশত কুইজের সঠিক উত্তরদাতা সমন্বয় চক্রবর্তীর জেলা বীরভূম ছাপা হয়েছে। ওটি উত্তর চব্বিশ পরগনা হবে।

উত্তর পাঠাও ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

বর্ষা চক্রবর্তী
অষ্টম শ্রেণি, মুকুল বসু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, কলকাতা।
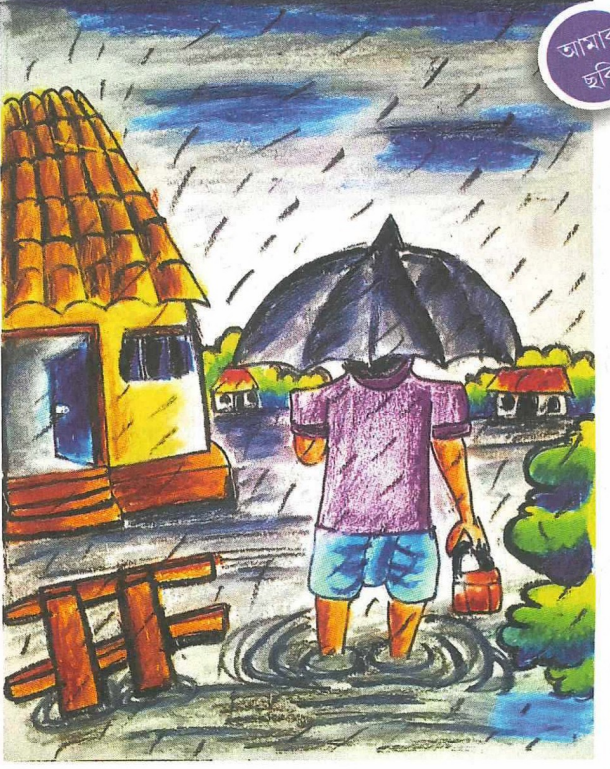
সৃজা আদক
তৃতীয় শ্রেণি, বাড়শুকলালচক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বসানচক,পূর্ব মেদিনীপুর।

মন

আকাশ আমার স্বপ্নদেশ
বাতাস আমার মন,
এ-দিক ও-দিক বেতাল রবে
বইছে সারা ক্ষণ।
মেঘের ঘরে বসত আমার
ভেসে ভেসে যাই,
স্বপ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে
তারই দিকে চাই।
সূর্য আমার তেজ
চাঁদ আমার হাসি,
তারারা সব যেন
বাজিয়ে যায় বাঁশি।

উজানি দে
শতদল বালিকা বিদ্যায়তন, ষষ্ঠ শ্রেণি, সুখচর, সোদপুর।

অদ্রীশ মাইতি
চতুর্থ শ্রেণি, সরস্বতী শিশু মন্দির, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও, anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায়।

খেপির কাণ্ড

ঋতিকা নাথ

খেপি যখন জন্মাল, তখন ওর নাম মোটেও 'খেপি' ছিল না। মা-বাবা অনেক খুঁজে একটা সুন্দর নামই মেয়ের ডাকনাম ধার্য করেছিলেন। কিন্তু সেই নাম, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু স্মৃতির খাতাতেই থেকে গেল। আর-একটা পোশাকি নাম অবশ্য ওর আছে, তবে সেটা স্কুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কাঠি কাঠি চেহারার উপরে আলুর মতো একটা মাথা, সেখানে কুল পাতার মতো বড় বড় গোল্লা গোল্লা দুটো চোখ, একটুখানি নাক আর মুখ দেখে প্রথম ধাক্কায় কেউই বুঝবে না যে, মেয়েটার

মাথায় ছিট আছে। সে ছিটের নমুনা শোনো।
খেপি তখন আরও ছোট। স্কুলেও ভর্তি হয়নি। বাড়িতেই মা'র কাছে 'অ-আ' পড়ে। ওদের বাড়িতে যিনি দুধ দিতে আসতেন, খেপি তাঁকে 'দুধ জ্যাঠা' বলে ডাকত। জ্যাঠা-জেঠিদের বাড়ি খেপিদের পাড়াতেই। এক দিন সকালে জ্যাঠা খেপিদের বাড়িতে দুধ পৌঁছে দিয়ে ওকে নিজের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। সে বাড়ির সাত হাত দূর থেকে গরুর গোবরের খোলতাই সুবাস সবার নাকে লাগে। তবে কিনা যে হেতু খেপির ছোটবেলা থেকেই জ্যাঠাদের বাড়ি আসা অভ্যেস, আর যে হেতু খেপির বাবার মত অনুসারে ওর নিজের মাথাতেও গোবর পোরা, সে হেতু খেপির গোবরের গন্ধে তেমন একটা সমস্যা হয় না। ও জ্যাঠার সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে দুধ জেঠি মহানন্দে বাড়ির দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছেন। দুধ জ্যাঠা খেপির হাতে তখনকার দিনের হিসেবে এক টাকায় দুটো ফুল ফুল ডিজ়াইনের বেকারির বিস্কুট কিনে দিয়েছেন। ও শান্ত মনে সেই বিস্কুট খাচ্ছে আর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জেঠির গোবরের তাল হাতে নিয়ে থপথপিয়ে দেওয়ালে মেরে মেরে ঘুঁটে দেওয়া দেখছে। খেপি এর আগে দেওয়ালে ঘুঁটে শুকোতে দেখেছে ঠিকই, কিন্তু ঘুঁটেটা গোবর থেকে কী করে দেয়, ও জানত না। কাজেই ফুল বিস্কুট খেতে খেতে, ঘুঁটে দেওয়া দেখতে দেখতে খেপি এক সময় মনের সুপ্ত ইচ্ছেটা জেঠিকে বলেই দিল, "আমিও ঘুঁটে দেব!"

জেঠি-জ্যাঠা ওর কথা শুনেই আঁতকে উঠলেন, "এ সব তোমার কাজ না মনা, তুমি বাড়ি গিয়া মন দিয়া লেখাপড়া করবা! এ সব আমরা গরিব লোকেরা করি।"

হ্যাঁ, বললেই হল! খেপি যেন কত বাধ্য! খানিক হাত-পা ছুড়ে চিল্লামিল্লি করার পরেও যখন জ্যাঠা-জেঠি কেউই ঘুঁটে দিতে দেওয়া তো দূর অস্ত, গোবর ছুঁতে পর্যন্ত দিলেন না, তখন খেপি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এল। মানে, জ্যাঠা-ই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন আর কী!
দুপুরবেলা খেপির মা খেপিকে ডালসেদ্ধ দিয়ে ভাত মেখে টিভি চালিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে স্নানে গেছেন। স্নান করে ফিরে দেখেন, খেপি ডালসেদ্ধ-ভাত দিয়ে সারা টিভির স্ক্রিনে ছোট ছোট হাতে ঘুঁটে দিয়েছে! প্রায় নিখুঁত ছোট্ট ছোট্ট ঘুঁটে।

মা'রা সবাই কি সুন্দর সাজুগুজু করেন, তাই না? লিপস্টিক, কাজল, তার পর কপালে ছোট্ট টিপ। খেপি হাঁ হয়ে ওর মাকে দেখে। ওর সব চেয়ে ভাল লাগে যখন ওর মা খুব সাবধানে আইব্রো পেনসিল দিয়ে ভুরু আঁকেন। ও মাকে কত বার বলে, "আমায় একটু এঁকে দাও!"

তা ওর মা মোটেই রাজি হন না। সুতরাং কী আর করা যাবে, এক দিন খেপি নিজেই মা'র আইব্রো পেনসিল দিয়ে ভুরু আঁকতে বসল। একটা ভুরু আঁকার পরে খেপির মনে হল, ভুরুটা বেশি ঘন হয়ে গেল। অপর ভুরুটা আঁকার পরে মনে হল, বাঁ দিকেরটা হালকা দেখাচ্ছে। এই বার এই ভাবে আঁকতে গিয়ে খেপি দেখে কাঠের আইব্রো পেনসিলটার কাজল ভোঁতা হয়ে গেছে। শার্পনার মা কোথায় রাখেন খেপি জানে না। মা জল খাচ্ছিলেন যখন, খেপি মা'র কাছে গিয়ে বলে, "মা আইব্রো পেনসিলটা একটু শার্প করে দেবে প্লিজ়?"

মা মেয়ের মুখপোড়া হনুমান-সম মুখ দেখে বিষম-টিসম খেয়ে একাকার!

খেপি একটু বড় হলে, মানে ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়াকালীন ওর একটা বোন হল। এই এতটুকুনি, হাত-পা নাড়ে আর হাঁ করে সবাইকে দেখে। খেপি বোনের দিদি হয়ে মহা খুশি! খেপি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে, তখন বাবা বাড়িতে একটা অখাদ্য জিনিস আমদানি করলেন, জিনিসটির নাম 'ত্রিফলা চূর্ণ'। ছোট্ট বোনটি বাদে বাড়ির আর সকলকে ত্রিফলা চূর্ণ খেতেই হবে, বাবার কড়া নির্দেশ। উষ্ণ গরম জলে ত্রিফলা চূর্ণ গুলে পানীয়টি একদম ঢকাস করে চোখ বুজে গিলে ফ্যালো। পেটের পক্ষে খুব ভাল, হজম শক্তি বাড়ে, রক্ত শোধন হয়, আরও নানান গুণে সমন্বিত পানীয়। কিন্তু খেতে? রাম! নাড়ি উল্টে আসে আর কী! খেপিকে বাধ্য হয়ে নাক-মুখ সিঁটকে ত্রিফলা চূর্ণ খেতে হয় আর ওর বাঁদর-সম মুখ খিঁচিয়ে খাওয়া দেখে, ছোট বোনটা হেসে কুটিপাটি! এক দিন দুপুরে যখন ছোট্ট বোনটা ঘুমোচ্ছে, তখন খেপি তিন আঙুলে এক চিমটে ত্রিফলা চূর্ণ কৌটো থেকে নিয়ে বোনের মুখটা গাল টিপে ফাঁক করিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে এল। ব্যস, বেচারি বোনের দিবানিদ্রা মাথায়! বোন সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে চাইল, খেপি তত ক্ষণে হাওয়া! এ দিকে বছর আড়াইয়ের শিশুটির একটা দুর্বলতা ছিল, ওর মুখের মধ্যে কিছু দেওয়া হলে বা ঢুকে গেলে ও সেটা চট করে ফেলে দিতে জানত না। কাজেই মুখে ত্রিফলা চূর্ণ নিয়েই বেচারি ঘুম থেকে উঠে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। মা-বাবা যে যেখানে ছিলেন দৌড়ে এলেন, এসেই দেখেন মুখের মধ্যে কালো কালো কী গুঁড়ো...

মুখ ধোয়াতে তাড়াতাড়ি কোলে করে বেসিনে নিয়ে যেতেই, ছোট্ট মেয়েটা একেবারে হড়হড়িয়ে দুপুরের ভাত বমি করে তবে থামল। অন্য দিকে মা-বাবা সমানে চেঁচাচ্ছেন, "কী হয়েছে? মুখে টিকটিকি পড়েছে? আর খেপি, তুইই বা কাঁদছিস কেন? তুই কিছু করেছিস? কী করেছিস? অ্যাঁ? তুই বোনের মুখে... এত বড় সাহস!"
বাকিটা তোমরা কল্পনা করে নিতে পারবে।

খাওয়া নিয়ে গল্প করতে করতে আর-একটা ঘটনা মনে পড়ল। এটা প্রায় থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। খেপি ছোটবেলায় মোটেই জল খেতে চাইত না, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাওয়ার কারণে নানান শারীরিক সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। ডাক্তারকাকু বলেছিলেন, "না চাইলেও ওকে জোর করে জল খাওয়াবেন।"

তিনি তো বলে খালাস, কিন্তু খেপিকে জল খাওয়ানো অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার। নিত্য মা'র হাতের চড়-চাপড়টা খেয়ে তবে যদি গ্লাস-খানেক জল পেটে যায়! এক দিন সকালে খাবার খাওয়ার একটু পরে মা এক গ্লাস জল নিয়ে ডাকছেন, "খেপি, জল খাবি আয়!"
নো পাত্তা। মা প্রথমে রাগ করলেন, "কোথায় গেলি? শিগগিরি আয়!"
কোনও সাড়া শব্দ নেই। মা এ বারে সারা বাড়ি খুঁজতে শুরু করলেন, "খেপি, কোথায় তুই? বেরিয়ে আয়!"
মেয়ে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। তখনও মোবাইল ফোন আসেনি, ল্যান্ড ফোনের যুগ। তড়িঘড়ি বাবার কাজের জায়গায় ফোন চলে গেল, "মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"
বাবা সব কাজ ফেলে বাড়ি ছুটে এলেন, "লাস্ট কোথায় দেখেছিলে?"
এরই মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে খবর চাউর হয়ে গিয়েছে, সব জেঠি-পিসি-কাকিরা এক বাক্যে জানিয়েছেন, খেপি

তাঁদের বাড়ি আসেনি। কেউ মন্তব্য করল, "আজ পাড়ায় একটা সন্দেহজনক চেহারার লোককে বস্তা কাঁধে নিয়ে ঘুরতে দেখা গেছে।"

খেপির মায়ের তো শুনেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া! তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে সাইকেলে লেগে বাবার প্যান্টের হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেছিল, তিনি পুলিশে খবর দেওয়ার আগে প্যান্ট বদলানোর জন্য আলনার কাছে গেছেন। আলনার উপর থাকা এক বান্ডিল জামা-কাপড় সরাচ্ছেন, হঠাৎ জামা-কাপড়ের তলা থেকে ডাক এল, "বাবা টু-উ-কি!"

এ বার মেয়ে পেয়ে মা-বাবা বুঝতে পারলেন না তাকে ধরে পিটোবেন, নাকি আদর করবেন!

এক দিন দুপুরে খেপিকে অঙ্ক করতে দিয়ে মা স্নানে গেছেন। স্নান সেরে এসে দেখেন মেয়ে খাতা-পেন ফেলে টেবিল-চেয়ারে বসে হাঁ করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে মহাজাগতিক দুশ্চিন্তা করছে। খেপির কাঠের স্টাডি টেবিলের উপরে একটা কাচ পাতা থাকত। লোকে শুভ কাজ শুরু করার আগে ঠুকে নারকেল ফাটায়, খেপির মা মেয়ের অবস্থা দেখে খেপে গিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে সেই কাচ-পাতা টেবিলের উপর মাথা ঠুকে খেপির মুখ ফাটালেন। এর পরে খানিক মিউচুয়াল চেঁচামেচি-কান্নাকাটি হওয়ার পরে যখন মায়ের রাগ প্রশমিত হল, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন, "তোর দাঁত ভেঙে গেছে!"

হ্যাঁ, খেপির সামনের দাঁত দুটো বেশ খরগোশ-মার্কা ছিল, সেই দাঁত একদম অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে ভেঙে গেছে। এ বার সেই ভাঙা দাঁত নানান সমস্যার সৃষ্টি করতে লাগল। প্রথমত, টক বা ঠান্ডা কিছু খেলেই দাঁত শির শির করে। এক দিন সবচেয়ে মারাত্মক হল, ছোট বোনটা দিদির কোলে চড়ে লাফাতে গেল, আর ওর সদ্য ন্যাড়া হওয়া কচি মাথায় দিদির হা হা হাসির সময় ভাঙা দাঁতের শিং ফুটে রক্তারক্তি! অতএব ছোটো ডেন্টিস্টের কাছে। মফস্‌সল শহরে মোটামুটি সবাই সবাইকে কম বেশি চেনেন। ডেন্টিস্টকাকু খেপির দাঁত দেখে হাঁ হয়ে গেলেন, "তোমার দাঁত এ ভাবে ভাঙল কী করে?"
খেপির বাবা আকাশে-বাতাসে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়ার লীলা খেলা দেখতে দেখতে দার্শনিক মুখে জানালেন, "ভেঙে যায়...কত রকম ভাবে ভাঙে...ছেলেমানুষ..."
ডাক্তারকাকু খানিক ক্ষণ বাবা-মেয়ের দিকে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে অবশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দাঁতের শিং দুটো মেশিন দিয়ে ঘষে সমান করে দিলেন।

খেপি ইস্কুলে তেমন একটা দুষ্টুমি করত না। শুধু এক বারের কথা মনে পড়ে, খেপির এক বান্ধবী ছিল। সেই বান্ধবীর সব ভাল, দোষের মধ্যে বেচারি টিফিনগুলো দুর্দান্ত আনত আর কাউকে শেয়ার করে খেতে চাইত না। খেপির এ দিকে বাঁধা টিফিন ছিল রুটি আর আলুভাজা। কোলের ছোট্ট বোনকে সামলে নিয়ে রোজ রোজ রকমারি টিফিন দেওয়া মায়ের পক্ষে দুরূহ কাজ, খেপি সেটা বুঝত বলেই মাকে বেশি জ্বালাত না। কিন্তু নিজে রুটি আলুভাজা কিংবা কুমড়োর ঘ্যাঁট আর পাশে বসা মেয়েটির রোজ রোজ চিপস, নুডলস কাঁহাতক সহ্য হয়?

নিয়ম অনুসারে কেউ টিফিনের থেকে একটু অংশ দিলে তাকে পাল্টা নিজের টিফিন থেকে সামান্য কিছু দেওয়া নিয়ম। কিন্তু সে মেয়ে, "রুটি? অ্যাঁক!" বলে ভারী কায়দা করে নাক সিঁটকে নিজের খাবার খেত। এক দিন ওই নাক-সিঁটকানো মুখ ব্যাঁকানো দেখে খেপির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। টিফিন পিরিয়ডে সবাই তখন খেলতে গেছে, ক্লাসরুম কম-বেশি ফাঁকা। সে দিন একটু দেরি করে আসার জন্য খেপি সামনের বেঞ্চে বসার সুযোগ পায়নি, একটা বেঞ্চ পরে বসেছিল। বান্ধবীটি সামনের বেঞ্চে বসে, ভারী আয়েশে নুড্‌লস খাচ্ছে। খেপি ব্যাগ থেকে জেল পেন বের করে হালকা হাতে বান্ধবীর পিঠের এক কোনায় লিখে দিল, 'গাধা'। ছোট্ট করে লিখেছিল, সে দিন আর কারও নজরে পড়ল না। পরের দিন খেপি আগে আগে এসে সামনের বেঞ্চে বসেছে, বান্ধবীর পাশে। এ বার বান্ধবীর পিছনের বেঞ্চে বসা মেয়েটির নজরে পড়ল, "হ্যাঁ রে, তোর জামায় কী লেখা আছে? হ্যাঁ? দেখি দেখি..."

তোমরা বুঝতেই পারছ, খেপি খেতে খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে মিষ্টি। নকুলদানা তো এতই পছন্দ ছিল যে, পাড়ার এক জেঠিমা প্রত্যেক দিন ঠাকুরপুজোর পরে পুজোর প্রসাদী নকুলদানা একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের কৌটোয় পুরে রেখে দিতেন। কৌটো ভর্তি হলে পরে খেপি যখন সেই জেঠিদের বাড়িতে বেড়াতে যেত, তখন তিনি নকুলদানাগুলো খেপিকে দিয়ে দিতেন। খেপিও মহানন্দে সেগুলো তারিয়ে তারিয়ে খেত।
খেপিদের বাড়িতে আগে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মা লক্ষ্মীর ঘট পুজো হত। খেপির ঠাকুরমা বেঁচে থাকাকালীন শুরু করেছিলেন, পরে খেপির মা পুজোর দায়িত্ব নেন। খেপির বাবার কাজ থেকে ফিরে স্নান সেরে পুজোর প্রসাদ খেতে খেতে বেলা গড়িয়ে যেত।
এক বার মা বাবার জন্য পুজোর প্রসাদ ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট ছোট্ট পিতলের রেকাবিতে পাকা কলার টুকরো আর নকুলদানা। বলা বাহুল্য খেপির অনেক আগেই নিজের প্রসাদ খাওয়া হয়ে গেছে, এ বার বাবারটা খেতে হবে। কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এখানে লোভে পিঁপড়ে।
মায়ের নজর বাঁচিয়ে টপাটপ নকুলদানা মুখে পোরার সময়ে খেপি অত বোঝেনি, পরে দেখে, নকুলদানা টক লাগে কেন? তার পরে যখন গোটা গোটা লাল পিঁপড়েগুলো চরম আক্রোশে মুখের মধ্যে কামড়াতে লাগল...

এ সব কারণের জন্যই যখন দিদা-দাদু খেপিদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন, মেয়েটি নিজের পিঠে, পায়ে, গায়ে লাল-নীল হয়ে থাকা মায়ের হস্তশিল্পের কারুকার্য দিদাকে দেখাত আর স্নেহপরায়ণ দাদু-দিদা মা'র উপর খুব রাগ করতেন, "এ ভাবে মারিস কেন?"
মা উত্তরে খ্যাঁক করে উঠতেন, "মারব না? তোমার নাতনির গুণের শেষ আছে?"

যাক গে, এ সব আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা। এখন সেই ছোটবেলাও নেই, সেই টিকটিকি লজেন্স...তিন টাকার কেকের যুগও নেই। তখন মানুষের মনটাই অন্য রকম ছিল। বিকেলের রোদ একটু বেশি সোনালি, মায়ের আদর একটু বেশি মিষ্টি লাগত। খেপির বোন এখন কলেজে পড়ে আর খেপিও বর্তমানের ব্যস্ততার মধ্যে এখনও পুরনো বই, পুজোর প্রসাদে সেই হারানো ছোটবেলা খোঁজে।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

ব্রাইট স্টার-এ ভারত

বায়ুসেনার মহড়া

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বায়ুসেনার এক সম্মিলিত অনুশীলনের আসর বসে প্রতি দু'বছরে এক বার, যার নাম 'এক্সারসাইজ় ব্রাইট স্টার-২৩'। এ বছর কায়রোয় এই মহড়ায় প্রথম বার অংশ নিচ্ছে ভারত। ভারত ছাড়াও এতে শরিক হবে আমেরিকা, সৌদি আরব, গ্রিস, কাতারের মতো অনেক দেশ। হঠাৎ যুদ্ধ বাধলে এই দেশগুলোর বায়ুসেনা একসঙ্গে যাতে তা ঠেকাতে পারে, তাই এই মহড়া।

ওয়াই ক্রোমোজ়োমের রহস্যভেদ

ওয়াই ক্রোমোজ়মের প্রতীকী ছবি

মানুষের প্রত্যেক কোষে আছে ৪৬টি ক্রোমোজ়োম, যারা আমাদের চলন, বলন, স্বভাব, প্রকৃতি, অসুখ, সমস্ত কিছুই প্রভাবিত করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে জটিল ওয়াই (Y) ক্রোমোজ়োম, যা শুধু ছেলেদের কোষে থাকে। এই একটি মাত্র ক্রোমোজ়োমের 'সিকোয়েন্স' দীর্ঘ দিন অজানা ছিল। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা তা জানতে পেরেছেন। এ থেকে নানা অসুখ ও মানুষের আয়ু সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আশা।

মার্কিন বায়ুসেনায় এআই

ভ্যালকিয়েরি যুদ্ধবিমান

আমেরিকার বায়ুসেনা জোরকদমে তৈরি করছে যুদ্ধবিমান, 'ভ্যালকিয়েরি'। এই বিমানে কোনও মানুষ বিমানচালক থাকবে না। সেনাবাহিনীর নির্দেশ মেনে এই বিমান চালাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। যুদ্ধবিমানের কাজ শত্রুকে নিকেশ করা। ফলে যন্ত্রের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র তুলে দেওয়ার আগে মার্কিন বায়ুসেনা ভ্যালকিয়েরিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ভাবে এআই-কে পাঠানোর পরিকল্পনা জানতে পেরে সারা পৃথিবীতে অনেকেই উদ্বিগ্ন।

হারিকোয়েক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ দিকে গত ২১ অগস্ট একই সময়ে তাণ্ডব চালিয়েছে হারিকেন হিলারি আর রিখটার স্কেলে ৫.১ মাত্রার এক ভূমিকম্প। দুইয়ে মিলে এই প্রলয়ের নাম নেটিজেনরা দিয়েছেন 'হারিকোয়েক' (হারিকেন+আর্থকোয়েক)। যদিও হারিকেনের সতর্কতা আগে থেকেই নেওয়ায় আর ভূমিকম্পও খুব জোরালো না হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি হয়নি।

ঝড়ের আগেই সতর্কবার্তা

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

শিক্ষার অধিকার সবার

শিক্ষার অধিকার এই পৃথিবীতে সবার আছে, তবু অভাব, অনটন, দারিদ্রে কাবু আজও পৃথিবীর কত শিশুই লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। সাক্ষরতার অধিকার সবাইকে মনে করিয়ে দিতে তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের শাখা সংস্থা ইউনেস্কো (ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজ়েশন) ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করে, প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে পালিত হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এই দিন যারা আজও অশিক্ষার অন্ধকারে, তাদের সাক্ষরতার আলোয় ফেরানোর অঙ্গীকার নেওয়ার দিন।

ভারতের ইঞ্জিনিয়ার দিবস

এম বিশ্বেশ্বরাইয়া

ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি। দেশে তখনও রাজত্ব করছে ব্রিটিশরা। তার আগেই এ দেশের একাধিক বাঁধ, সেতু, সড়ক আরও কত কী নির্মাণ করে দেশকে মজবুত করে দিয়ে গিয়েছিলেন এক প্রণম্য ইঞ্জিনিয়ার, এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। ১৯৫৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, ভারতরত্ন পান বিশ্বেশ্বরাইয়া। ভারতের কৃষিকাজ, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা সবেতেই উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে যাওয়া এই মানুষটির জন্মদিনে, ১৫ সেপ্টেম্বর, আজও সারা দেশে পালিত হয় ইঞ্জিনিয়ার দিবস।

লাল পান্ডা

লাল পান্ডাদের দিন

দুশো বছরও হয়নি, ১৮২৫ সালে হিমালয়ের পূর্ব দিকে আর চিনে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল স্তন্যপায়ী প্রাণী রেড পান্ডাকে। মানুষের কোনও ক্ষতি ওরা করেনি, তবুও মানুষের উপদ্রবে ওদের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। অথচ এই গ্রহে মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্য সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকেই যে তার দরকার, এ কথা আমরা সেই কবেই জেনেছি। সেই সূত্রে রেড পান্ডাদের সংরক্ষণও যে জরুরি, সে কথা আমাদের মনে করাতে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় শনিবার পালিত হয় লাল পান্ডাদের আন্তর্জাতিক দিন। এ বছর পালিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বর।

সোনায় মোড়া নীরজ

টোকিয়ো অলিম্পিক্স, ডায়মন্ড লিগের পর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সেও সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া। লিখেছেন **মধুরিমা সিংহ রায়**

টোকিয়ো অলিম্পিক্সের পর ডায়মন্ড লিগেও সোনা জিতেছিলেন। আর এ বার যেন ষোলো কলা পূর্ণ হল নীরজ চোপড়ার। বুডাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে মহার্ঘ সোনার পদকও নীরজের ঝুলিতে। বয়স মাত্র পঁচিশ। ইতিমধ্যেই যে সব মেডেল তিনি দখল করেছেন, তার জন্য হয়তো গোটা জন্ম অপেক্ষা করতে হয় কোনও কোনও অ্যাথলিটকে। তবে তিনি সেই বিরল প্রজাতির ‘গ্রেট’দের মধ্যে অন্যতম, যিনি সাফল্যেও ধীর-স্থির থাকেন। একের পর এক পদকেও কখনও মেজাজ বদলে যায় না, মাটি থেকে পা সরে যায় না। অভিনব বিন্দ্রা ছাড়া ভারত থেকে তিনিই এক মাত্র ব্যক্তিগত বিভাগে অলিম্পিক্স সোনাজয়ী। তার আগে ২০১৮-র জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা, ২০১৮-র গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে সোনা...তারও আগে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা-সহ অসংখ্য কৃতিত্বে ভরপুর তাঁর কেরিয়ার। বাকি ছিল শুধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। গত বার এখানেই সোনা ফস্কেছিলেন, সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল রুপোয়। কিন্তু এ বার এক রবিবাসরীয় মাহেন্দ্রক্ষণে সেরা থ্রো-টা এল তাঁর জ্যাভলিন থেকেই। ৮৮.১৭ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়লেন তিনি। তার সঙ্গেই আরও এক বার নতুন করে ইতিহাসের বইয়ে ঢুকে পড়লেন নীরজ। দ্বিতীয় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম, তাঁর থ্রোয়ের দূরত্ব ৮৭.১৫ মিটার। টুর্নামেন্টের আগে নীরজ বলেছিলেন, “আমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। এটা ঠিক যে অলিম্পিক্সের পরেও আমি বেশ কয়েকটা প্রতিযোগিতায় জিতেছি। কিন্তু এখানে সোনার পাশাপাশি আমার লক্ষ্য ৯০ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছোড়া।” বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নীরজকে ঠিক কী ভাবে মনে রাখবে, তা তাঁর এই কথাতেই বোধ হয় স্পষ্ট। বড় সাফল্যের পর ‘সব পেয়েছি’ গোছের মনোভাব কোনও দিনই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। বরং, সব সময় নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই করেছেন তিনি। কয়েক বছর আগে এই প্রতিবেদককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নীরজ জানিয়েছিলেন জ্যাভলিনে তাঁর হাতেখড়ির সময়ের কথা। গ্রামের রাস্তায় দৌড়োতেন, খেলাধুলোয় কেরিয়ারের কথা মোটেও ভাবেননি।

“মোটা হয়ে যাচ্ছিলাম বলে গ্রামেরই এক জায়গায় ট্রেনিং করতাম। সেখানে দেখলাম কয়েক জন জ্যাভলিন থ্রো করছেন। আমি বললাম, আমিও ট্রাই করব। একদম ঠিকঠাক থ্রো করেছিলাম। তখন ওঁরা বললেন, ওঁদের সঙ্গে ট্রেনিং করতে। সে ভাবেই শুরু। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স হবে তখন,” বলেছিলেন নীরজ। আরও জানিয়েছিলেন, “আমি কখনওই বলব না ক্রিকেট বা ফুটবলকে কম সমর্থন করুন। ক্রিকেট তো শুরু থেকেই জনপ্রিয়। কিন্তু তার সঙ্গে বাকি খেলাগুলোকেও সমর্থন করা জরুরি।”

যে দেশে ক্রিকেটকে ধর্ম মানা হয়, সেখানে অলিম্পিক্স গেমসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ নীরজ। বর্তমানে তিনিই বোধ হয় দেশের সেরা অ্যাথলিট পোস্টার বয়। দেশবাসীর প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কান্ডারি তিনি।

সাফল্যেও ধীর-স্থির নীরজ

জ্যাভলিন ছোড়ার মুহূর্তে

বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কার্লসেনের মুখোমুখি

বিস্ময় বালক প্রজ্ঞানন্দ

দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারলেও দেশের চোখের মণি হয়ে গিয়েছেন আঠারোর এই বালক। আর প্রজ্ঞানন্দকে নিয়ে লিখেছেন **সায়ক বসু**

মাস কয়েক আগের কথা। একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রজ্ঞানন্দ এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, একটি কঠিন ম্যাচ খেলার পর কমেডি সিরিজ় দেখতে ভালবাসেন তিনি। বা হাঁটতে যান একা একা। প্রস্তুত করেন নিজেকে। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপ ফাইনালে কার্লসেনের কাছে টাইব্রেকারে হেরে যাওয়ার পর কি ভারতের দাবা-বিস্ময় আর প্রজ্ঞানন্দ নিজেকে নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনবেন সমগ্র দেশবাসীর কাছে? গোটা বিশ্বে এমন কিছু কিছু খেলোয়াড় থাকেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে কাছে টেনে নেন। জেতা-হারা সব তুচ্ছ হয়ে যায় তাঁর কাছে। আঠারো বছর বয়সি প্রজ্ঞানন্দ ঠিক সে রকমই এক জন খেলোয়াড়। দাবায় নিজের অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন এ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। কার্লসেনকে প্রথম দু'রাউন্ডে আটকেও দিয়েছিলেন, ড্র করে। কিন্তু টাইব্রেকারে হেরে গেলেন স্রেফ কার্লসেনের অভিজ্ঞতার কাছে। তবে এই হারে প্রজ্ঞার কৌলীন্য কমেনি। বরং দেশবাসীর চোখের মণি হয়েছেন তিনি। বিশ্বনাথন আনন্দের পরে এমন এক জনকে পাওয়া গিয়েছে, যাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে দেশ। এবং প্রজ্ঞানন্দের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা তো স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ কার্লসেনও। প্রজ্ঞার ধীর-স্থির মাথায় খেলার ক্ষমতা প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, "প্রজ্ঞানন্দের মানসিক স্থিরতা যেন দানবের মতো! তাঁর হাতে দাবার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" ২০০২ সালে বিশ্বনাথন আনন্দ দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল পৌঁছেছিলেন। তার পরে এই প্রজ্ঞানন্দই দেশের প্রথম দাবাড়ু, যিনি এই সাফল্য ছুঁতে পারলেন। আসলে ছোট্টবেলা থেকেই প্রজ্ঞা বাড়ির খুব শান্ত এবং ধীর-স্থির একটি ছেলে। ২০০৫ সালের ১০ অগস্ট চেন্নাইয়ে জন্ম নেওয়ার পর বাড়িতে দাবার পরিবেশই পেয়েছেন। তাঁর দিদি বৈশালী রমেশবাবুও এক জন নামী দাবাড়ু। ২০১৩ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-৮ ওয়ার্ল্ড ইউথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন প্রজ্ঞা। সেখানে জেতার পরে ফিডে মাস্টারের খেতাব অর্জন করেন তিনি। ২০১৩ সালে বিশ্ব যুব দাবা প্রতিযোগিতা জেতা দিয়ে শুরু। তার পর কোনও দিন আর পিছনে তাকাতে হয়নি প্রজ্ঞানন্দকে। একের পর এক প্রতিযোগিতায় ট্রফি, এ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল... যাত্রাপথটা আকর্ষণীয় হলেও, প্রজ্ঞা সেটিকে স্বাভাবিক চোখেই দেখেন। তাঁর বাবা রমেশবাবু এক জন ব্যাঙ্ককর্মী এবং মা নাগালক্ষ্মী হোমমেকার। দু'জনেরই শান্ত স্বভাব প্রজ্ঞাকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেছিলেন, "বাড়িতে আমার সাফল্য নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি কখনওই হয় না। মা নিজের হাতে রান্না করেন। বাড়ির সকলে বসে এক সঙ্গে খাই। এটাই এক ধরনের সেলিব্রেশন।"

কিন্তু এ সবের মধ্যেই প্রজ্ঞা যেটা করেন, তা হল নিজের খেলা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা। এই যে খেলার পর হাঁটতে বেরোন তিনি, সেখানে সব সময় নিজের পুরনো খেলার ভুলভ্রান্তি নিয়েই ভাবেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "আমার একটাই লক্ষ্য, আমি একটা খেলায় যা যা ভুল করি, সেগুলোর যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়। আমি হয়তো কমেডি শো দেখে বা ফিল্ম দেখে নিজেকে ভুলিয়ে রাখি, কিন্তু মাথায় ৬৪ খোপের খেলাই চলে।" আশা করা যায়, এই ভুল শুধরে নিয়েই এগিয়ে যাবেন প্রজ্ঞানন্দ। যেটুকু যা অপ্রাপ্তি, তা পূরণ করে ফেলবেন অচিরেই।
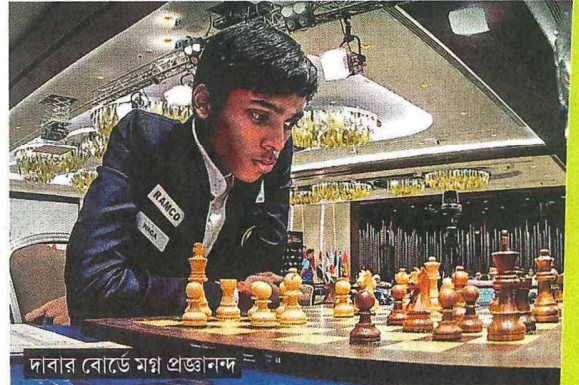
দাবার বোর্ডে মগ্ন প্রজ্ঞানন্দ

ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার বিপক্ষে বিস্ময়বালক প্রজ্ঞানন্দ

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটে এল জয়

সোনাজয়ী ভারতীয় মেয়েদের দল

বার্মিংহামে দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট থেকে সোনা জিতে আনল ভারতের মেয়েরা। আইবিএসএ বিশ্ব গেমসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এল সোনার পদক। ইন্টারন্যাশনাল ব্লাইন্ড স্পোর্টর্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই গেমসে ক্রিকেটে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দু'টি দলই ফাইনাল খেলে। পুরুষরা ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে গেলেও মেয়েরা দেশকে সোনা এনে দিয়েছেন। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারান বাসন্তী হাঁসদারা। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৪ রান করে। পরে বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস প্রথায় ভারতের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় ৪২ রান। ৩.৩ ওভারে সেই রান তুলে সোনা জিতে নতুন ইতিহাস গড়েন ভারতের মেয়েরা।

অবসর ভাঙলেন স্টোকস

আবার এক দিনের ক্রিকেটে ফিরে এসেছেন তিনি। ২০১৯ সালে লর্ডসে এক দিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। নিউ জ়িল্যান্ডকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ইংলিশ অলরাউন্ডার, বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রু স্টোকস। ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও ইংল্যান্ড দলের জয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেললেও বত্রিশ বছরের এই অলরাউন্ডার ২০২২ সালের জুলাই মাসে হঠাৎই এক দিনের ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। নিউ জ়িল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জন্ম হলেও বারো বছর বয়স থেকে উত্তর ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠেন স্টোকস। আগামী অক্টোবরে ভারতের মাটিতে বসছে এক দিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড স্টোকসকে আবার বিশ্বকাপে ফেরাতে উদ্যোগী হয়। বোর্ডের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে আবার এক দিনের ক্রিকেটে ফিরেছেন স্টোকস। চলতি বছরে আইপিএলে তিনি ছিলেন চেন্নাই সুপার কিংস দলের ক্রিকেটার। ডান হাতে বল আর ব্যাট করেন বাঁ হাতে। স্টোকস দলে ফেরায় বিশ্বকাপে অনেক শক্তিশালী দল নিয়ে লড়াইয়ে নামবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড।

বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রু স্টোকস

হিনাতার হাতে সোনার বুট

হিনাতা মিয়াজাওয়া

মেয়েদের বিশ্বকাপ ফুটবলে সোনার বুট জিতলেন জাপানি ফুটবলার হিনাতা মিয়াজাওয়া। ২০১১ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাপান এ বার গোড়া থেকেই নিখুঁত পাসিং ফুটবল খেলেছে। প্রথমেই তারা জাম্বিয়াকে ৫-০ গোলে হারায়। প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে নজর কাড়েন হিনাতা মিয়াজাওয়া। বিশ্বকাপ যত এগিয়েছে, হিনাতা ততই দুর্ধর্ষ ফুটবল উপহার দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। স্পেন গ্রুপ লিগে জাপানের কাছে ৪-০ গোলে হারে। সেখানেও জোড়া গোল করেন হিনাতা। ফরোয়ার্ড না হয়েও গোল করাটাই যেন তাঁর নেশা। কোয়ার্টার ফাইনালে সুইডেনের কাছে জাপান হেরে গেলেও সর্বোচ্চ ৫ গোল করে সোনার বুট জিতে দেশে ফেরেন হিনাতা।

অবশেষে ব্রায়ার্ন মিউনিখে হ্যারি

হ্যারি কেন

ইংল্যান্ড ফুটবল দলের অধিনায়ক হ্যারি কেন চলতি মরসুমে জার্মান ঘরোয়া লিগে খেলতে নেমেছেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে জার্মান বুন্দেশ লিগার দল বায়ার্ন মিউনিখে নাম লিখিয়েছেন। তাঁর এই দল-বদল ঘিরে নানা জল্পনা চলেছে বহু দিন। বায়ার্নের মতোই হ্যারিকে দলে টানতে প্রথমে মাঠে নেমে পড়েছিল প্রিমিয়ার লিগের নামী দল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, স্পেনের লা লিগার রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা ফ্রান্সের পিএসজির মতো দলও। পরে অবশ্য এই দলগুলো সরে যায়। বায়ার্নের সঙ্গেই চলে টটেনহ্যামের দর কষাকষি। জানা যাচ্ছে, ৮২৮ কোটি টাকায় চার বছরের চুক্তিতে বায়ার্নে নাম লিখিয়েছেন হ্যারি। প্রতি সপ্তাহে ব্রায়ার্নের কাছ থেকে নাকি প্রায় চার লক্ষ ইউরো বেতন পাবেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। টটেনহ্যাম অকাদেমি থেকে উঠে আসা হ্যারি ২০১২ সাল থেকে সিনিয়র দলের হয়ে মাঠে নামছেন। ইংল্যান্ডের জার্সিতে সর্বোচ্চ ৫৮ গোলের রেকর্ড রয়েছে তাঁর। তবে ক্লাব কিংবা দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত বড় কোনও শিরোপা পাননি। টানা ১১তম লিগজয়ী দল বায়ার্নের হয়ে মাঠে নেমে ইতিমধ্যে গোল পেয়েছেন হ্যারি।

বিশ্বের দ্রুততম মানব নোয়া

নোয়া লাইলস

দারুণ জয়! বুদাপেস্টের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে নেমে তিনি এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন কেউই ভাবেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ছাব্বিশ বছরের এই অ্যাথলিট নোয়া লাইলসের যত কৃতিত্ব ছিল ২০০ মিটার দৌড়েই। গত দু'টি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ২০০ মিটারে সোনাজয়ী। কিন্তু ১০০ মিটার স্প্রিন্টে নেমে সবাইকে পিছনে ফেলে ৯.৮৩ সেকেন্ড সময়ে দৌড় শেষ করে তিনিই হয়েছেন বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব। নোয়ার অবাক গল্প এখানেই শেষ নয়। জামাইকার কিংবদন্তি স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের ১০০ মিটার দৌড়ে ৯.৫৮ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ডের পাশেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটারে হ্যাটট্রিক রয়েছে। ২০১৭ সালে বোল্ট অবসর নেওয়ার পর গত দু'টি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটারে সোনাজয়ী নোয়া এ বারও ১৯.৫২ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতে বোল্টের হ্যাটট্রিক স্পর্শ করেছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে শেষ বার ২০১৫ সালে ১০০ ও ২০০ মিটারে সোনা জিতে 'ডাবল' জিতেছিলেন সর্বকালের সেরা তারকা বোল্ট। এ বার বোল্টের সেই কৃতিত্ব ছুঁয়ে ফেলেছেন নোয়া।

বিশ্ব দাবায় সেরা কার্লসেন

ভেন ম্যাগনাস ওয়েন কার্লসেন

বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু নরওয়ের ভেন ম্যাগনাস ওয়েন কার্লসেন বনাম ভারতের আঠারো বছরের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের লড়াই। আজেরবাইজানের বাকুতে এ বারের ফিডে বিশ্বকাপ দাবার এই ফাইনালের দিকে নজর ছিল সবার। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কার্লসেন বিশ্বকাপ দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন। তবে একের পর-এক বিশ্বসেরা দাবাড়ুকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে নজর কেড়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। ২০১৩ সালে ভারতের বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়েই প্রথম বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন কার্লসেন।
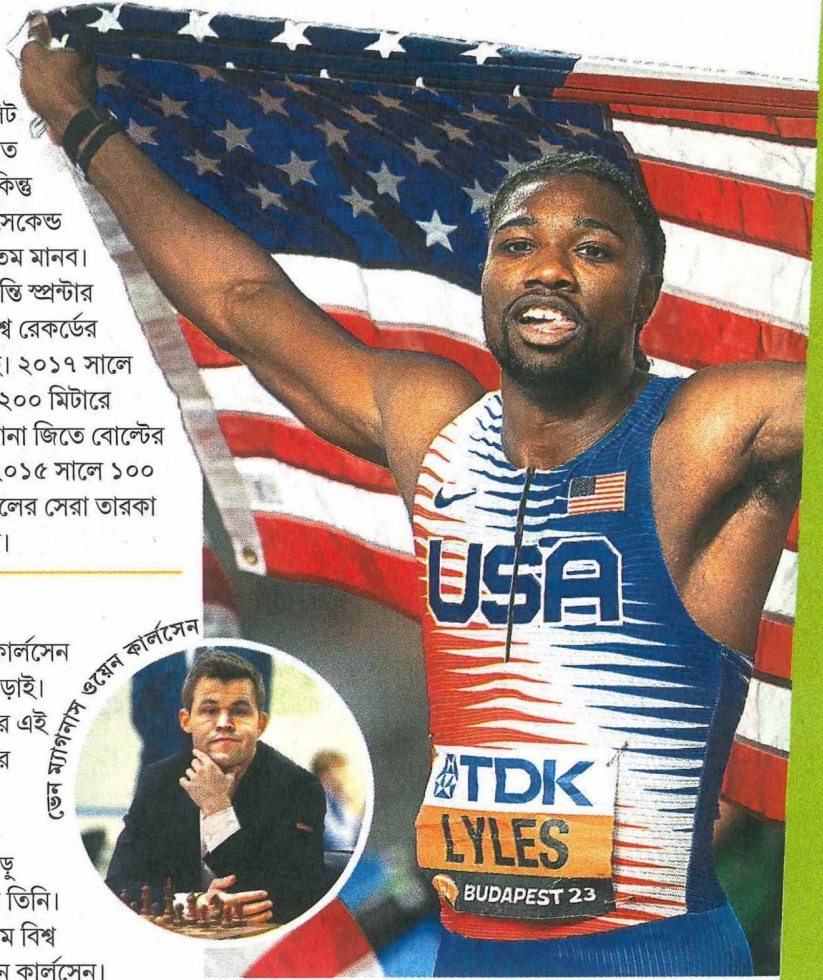
সিএলটিতে টেবল টেনিসের আসর

সিএলটি-তে খুদে প্রতিযোগীরা
ফটো: লেখক

চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার— সিএলটি বলেই যার খ্যাতি। এক ঝাঁক কচিকাঁচাকে নিয়ে সম্প্রতি এখানেই হল ৪৪তম বয়সভিত্তিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। অংশ নিল কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনার ২০৮ জন খুদে প্রতিযোগী। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে সিএলটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায় ছোটদের এই টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। কলকাতায় সিএলটির নিজস্ব বাড়িতে টেবিল টেনিস শেখানো হয়। এখানকারই এক মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শুভজিৎ নাগ গ্রিসের সামার প্যারা-অলিম্পিক্স থেকে জিতেছিলেন সোনার পদক। এ বারের বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজর কেড়েছে স্নেহাশ্রী অধিকারী। কেওড়াপুকুরের সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীটি প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হয়ে পেয়েছে ইন্দুপুরী চ্যালেঞ্জ ট্রফি। বালক বিভাগে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছে রাজডাঙার শ্রীরাম নারায়ণ সিংহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অমলিক দাস। পেয়েছে কপিলমোহন সেন চ্যালেঞ্জ ট্রফি। প্রবীণ টেবিল টেনিস কর্তা রবি চট্টোপাধ্যায় জানালেন, সিএলটি শুধু খেলাধুলোতেই নয়, ছোটদের নাচ, গান, নাটক, ছবি আঁকাতেও উৎসাহ দিয়ে চলেছে। অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর, নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায় প্রমুখ ছিলেন সিএলটির প্রথম দিকের শিক্ষার্থী। জওহরলাল নেহরু ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমন্ত্রণে ষাটের দশকে সিএলটির শিশুশিল্পীরা পূর্ব ইউরোপ সফরে যায়।

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

তা	লা	চা	বি
ল	ক্ষ্য	ভে	দ
কা	র	খা	না
না	র	কে	ল
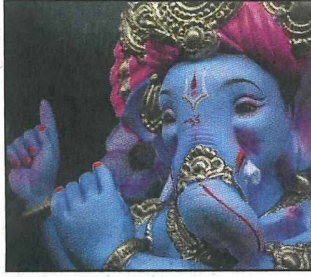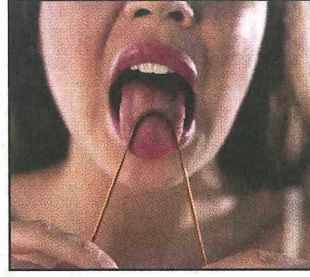
ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত : মাথা নিচু করে পা শূন্যে তুলে উল্টে পড়া অবস্থা।

৫ অগস্ট সংখ্যার সমাধান

তা ল কা না।

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

৫ অগস্ট সংখ্যার সমাধান :

সহজ : ১৭ – (২ + ৫) – ৩ = ৭

মাঝারি : (১৭ × ২) – (৫ × ৩) = ১৯

কঠিন : (৩ × ১৭) ÷ (৫ – ২) = ১৭

সৌম্যকান্ত সেন, *সপ্তম শ্রেণি, পার্ল রোজারি স্কুল, হুগলি।* **বৈশালী পোদ্দার,** *অষ্টম শ্রেণি, অগজিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **বৈভব নাইয়া,** *সপ্তম শ্রেণি, মজিলপুর জেএম ট্রেনিং স্কুল, দঃ ২৪ পরগনা।* **বিতান পোদ্দার,** *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।* **স্পন্দন ভাদুড়ী,** *পঞ্চম শ্রেণি, বিড়লা হাই স্কুল, কলকাতা।* **রাজর্ষি সাহা,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া।* **সপ্তক ঘোষ,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বীরভূম।* **অদ্রীশ মাইতি,** *চতুর্থ শ্রেণি, সরস্বতী শিশু মন্দির, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর।* **অনন্ত্রম দাস,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া।* **শৌর্যেশ চট্টোপাধ্যায়,** *দ্বিতীয় শ্রেণি, শ্রী অরবিন্দ এডুকেশন সেন্টার, পুরুলিয়া।*

জামদানি থেকে জাম্পসুট

দুই বাঙালির
এক ঠিকানা

ইনস্টল করে রেজিস্ট্রেশন করলেই আপনার জন্য থাকছে
বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।

আরও সাহিত্য | বই ও ম্যাগাজিন | আরও খবর
আরও খেলা | আরও বিনোদন | পডকাস্ট
গেমস কর্নার | আনন্দপ্লেক্স | বিষয় বৈচিত্র

QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন

AARO ANANDA available on

sosideas